শিশু-কিশোর উপযোগী
গল্প সংকলন

নীল দরিয়ার নামে

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

নীল দরিয়ার নামে

[শিশু-কিশোর উপযোগী গল্প সংকলন]

মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

মুহাদ্দিস্, খতীব ও লেখক

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

নীল দরিয়ার নামে
মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ২০০৭ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ২০০৫ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-04-0

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Neel Doriar Name
Muhammad Zainul Abideen
Prce : Tk. 50.00 only
US $: 2.00

আত্মজ
সালমান আদীব সা'দ
আমার স্বপ্নের পৃথিবী!

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোর উপযোগী বই ঃ

শহীদানের গল্প শোন
(সিরিজ ১-১০)
হযরত হামযা (রাযিঃ) ১ম খন্ড
মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

আলোর ফোয়ারা
(আরবী শিশু সাহিত্য অবলম্বনে রচীত)
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন
মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা

কিশোর সাহাবী
(সিরিজ ১-১০)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ১ম খন্ড
মাওলানা ফয়জুল্লাহ
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

আমার কথা

'নীল দরিয়ার নামে' ছোটদের জন্যে লেখা একগুচ্ছ গল্প। এই গল্পগুলো পড়ার পূর্বেই যে কথাটা মনে রাখতে হবে তাহলো, আমি কোন গল্পকার নই! বরং বিশ্বাসের তাগিদে দু'চার কথা লেখি, অনুবাদ করি। তাছাড়া ছোটদের জন্যে লেখা এমনিতেই একটু কঠিন।

কবিগুরু বলেছিলেন-

'সহজ করে লেখতে আমায় কহ যে,
সহজ করে যায় না লেখা সহজে।'

সম্ভবত বছর দুয়েক আগের কথা। সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের কিশোর পাতার সম্পাদক সুহৃদ সমর ইসলাম খোকা ভাই আরবী সাহিত্যের কিছু সবুজ রস এদেশীয় কিশোর বন্ধুদের মুখে তুলে দিতে বলেন। আমি রবি বাবুর দোহাই দিয়ে বলি- এ বেশ কঠিন কাজ! তিনি বলেন ঃ তবুও দিন! সুস্থ কিছু দিন। তারপর চাপাচাপি! মূলত এই গ্রন্থের প্রায় সবগুলো গল্পই তার সাগ্রহ ফরমায়েশের ফসল! তাকে অনেকগুলো ধন্যবাদ। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করে সংকলনের দায়িত্ব পালন করেছেন আমার জীবনসঙ্গিনী দিলরুবা উম্মে আদীব। গ্রন্থাকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন সুহৃদ সাধু প্রকাশক মাওলানা হাবীবুর রহমান খান! বইটির প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন কবি বন্ধু আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী। আমি সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ!

বইটিতে সাহিত্যের রস না থাকলেও সত্যের আলো আছে, আদর্শের দীপ্তি আছে – শুধু এই ভরসায় পাঠক বন্ধুদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

বিনীত
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আলম সাহেবের চেয়ে দ্রুত অথচ স্পষ্ট কথা বলতে আমি আমার জীবনে কাউকে দেখিনি। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ক্যালিগ্রাফী শিল্পী জনাব আরিফুর রহমান সাহেবের অফিসে। কাজের সুবাদে প্রায়ই আমাদের সেখানে দেখা-সাক্ষাত হয়।

সম্ভবতঃ গত ১৪২২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের কথা। আমি জনাব আরিফুর রহমান সাহেবের অফিসে গ্রাফিক্সের কাজ করাচ্ছি, ইত্যবসরে জনাব আলম সাহেব সেখানে আসলেন এবং কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই আমাকে আক্রমন করে বসলেন ঃ "আপনারা-হুজুররা! কোন কিছুই সহজ করে লিখতে ও বলতে পারেন না, সবকিছুকেই একেবারে কঠিন করে ফেলেন।" তাঁর হঠাৎ আক্রমনের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে আমি বিনয়ের সাথে বললাম ঃ "ভাই! কি হয়েছে খুলে বলুন!" অতপর তিনি যা বললেন, তার সারাংশ হল, তিনি তার ছোট্ট মেয়ের জন্য শিশু-কিশোর উপযোগী বই কিনতে গিয়েছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী বই মেলায়, কিন্তু সেখানে তিনি বাচ্চাদের উপযোগী বই তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাননি। তাই তিনি ভীষণ ক্ষেপেছেন। বিষয়টি আমাকেও ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলে। আমিও চিন্তা করি সত্যিই তো! আমার আত্মজ সা'দ, সুমাইয়া, খাদীজাও তো গল্প শোনার আব্দার করে, তাদের মা-ও প্রায়ই বলে "তুমি মানুষ কে এত কিছু শোনাও, বাচ্চাদের সুন্দর গল্প শোনাতে পার না, ওরাতো গল্প শোনতে চায়।"

উপরোক্ত ঘটনাবলী ও কথাগুলো আমি আমাদের প্রিয়বন্ধু, সু-সাহিত্যিক জনাব যাইনুল আবিদীনকে শোনালাম। তখন তিনি বললেন, সাপ্তাহিক "মুসলিম জাহান" পত্রিকায় "কিশোর জাহান" বিভাগে প্রকাশিত আমার কিছু শিশু-কিশোর উপযোগী গল্প আছে, আপনি চাইলে সেগুলোকে বই আকারে প্রকাশ করতে পারেন। এ প্রস্তাব ও পর্যালোচনার ফসলই হলো, আমাদের এবারের

আয়োজন "নীল দরিয়ার নামে" আমরা আশা করি আমাদের এ আয়োজন শিশু-কিশোরদের ইসলামী মনন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

আল্লাহপাক আমাদের এ উদ্যোগকে কবুল করে নাজাতের উসীলা বানান। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

তারিখ ঃ ২৭ শে জিলক্বদ ১৪২৩ হিজরী

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
আজীমপুর, ঢাকা

সূচীপত্র

নীল দরিয়ার নামে

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযিঃ)-এর শাসনকাল। চারদিকে কেবল বিজয়ের নবউদ্যম। সংগ্রামী মুসলিম সৈনিকরা যেদিকে যান সেদিকেই উড়ান বিজয়ের পতাকা। মুসলমানদের সে এক সোনালী যুগ।

ঠিক সেই সময়ের কথা। হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) জয় করেছেন মিসর। এখন তিনি সেখানকার গর্ভনরও। দেশ চলছে বহতা নদীর মতো। কোথাও দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই। ভোরের মৃদু সমীকরণ যেন সদা শীতল করে যাচ্ছে তাদের সকল অনুভূতি। এরই মধ্যে এলো জুন মাস। জুন মাস আসতেই মিসরের আদি বাসিন্দাদের একটি প্রতিনিধি দল হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)-এর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করল। সাক্ষাৎ করে জানাল-

'মাননীয় গভর্নর! এই যে নীল দরিয়া আছে, তার একটা অভ্যাস আছে। যদি সেটা রক্ষা না করা হয় তাহলে জোয়ার বন্ধ হয়ে যাবে এবং দরিয়া শুকিয়ে যাবে।'

ঃ সেই অভ্যাসটি কি? গভর্নর জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ অভ্যাসটা হলো, এই মাসের বারটি রাত পূর্ণ হবার পর আমরা এক যুবতী-সুন্দরী দুলালীকে তার মা-বাবার কাছ থেকে চেয়ে আনি। তারপর তাকে খুব উন্নত পোশাক ও অলংকার সজ্জিত করে দরিয়ার মধ্যে ফেলে দিই। অতঃপর দরিয়া ভীষণ উন্মাদনার সঙ্গে বইতে থাকে।

ঃ আমর বললেন- ইসলামে এই জাতীয় কুসংস্কারের অবকাশ নেই! অতীতের সকল অন্ধ প্রথাকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

নিরাশ হলো প্রতিনিধি দল। তারা চলে গেল। কিন্তু দেখা গেল কি- জুন, জুলাই, আগস্ট পুরো তিন মাস নদী শুকনো পড়ে আছে। পানির অভাবে নীল দরিয়ার প্রতিবেশীরা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করেছে। বিষয়টি কেউ কেউ সংশয়ের চোখে দেখছে। কী করা যায় এখন! ভাবনায় পড়ে গেলেন বীর সেনানী আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)।

অবশেষে একটি চিঠি পাঠালেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাযিঃ) -এর কাছে। পুরো ঘটনা তুলে ধরে সবিনয় পরামর্শ চাইলেন। হযরত উমরও দেরি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে লেখে পাঠালেন-

তোমার সিদ্ধান্তই সঠিক। ইসলাম অতীত দিনের কোন কুসংস্কারকে স্বীকার করে না। বরং সেসব অন্ধ রেওয়াজ ভঙ্গের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। আর শোন! আমি তোমার কাছে একটি চিরকুট পাঠিয়েছি। এই টিরকুটটি নীল দরিয়াকে দেবে!

'আমর (রাযিঃ) বিস্ময়ের সাথে চিরকুটটি খুললেন। দেখলেন তাতে লেখা আছে-

'আল্লাহর বান্দা উমর-আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে মিসরের নীল দরিয়ার নামে। অতঃপর কথা হচ্ছে, হে নীল নদ! তুমি যদি তোমার শক্তিবলে প্রবাহিত হয়ে থাক তাহলে তোমার আর প্রবাহিত হবার প্রয়োজন নেই। আর যদি মহান পরাক্রমশীল এক আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন তাহলে আমরা সেই আল্লাহর দরবারেই প্রার্থনা করছি- তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।'

হযরত 'আমর ইবনুল আস যখন এই চিঠি পেলেন তখনও খ্রিস্টানদের ঈদ পর্বের একদিন বাকী। তারা সকলেই স্থান বদলের জন্যে প্রস্তুত। আমর (রাযিঃ) চিরকুটটি নীল দরিয়ায় ছুঁড়ে মারলেন।

আর অমনি দরিয়া প্রবাহিত হতে লাগল। প্রভাতকালে মিসরবাসী দরিয়ার তীরে পৌঁছে তো বিস্ময়ে অবাক! জল থই থই নীল! তাও এক দিনে প্রায় ষোল হাত পানির জোয়ার!!

ইসলামের আদর্শ-বিশ্বাসে তারা দারুণভাবে মুগ্ধ হলো। নীল দরিয়ার ঠিকানা ছেড়ে কাউকেই চলে যেতে হলো না আর।

(সূত্র ঃ তারাশে-৩৮ পৃ.)

হাদীস শরীফের গল্প

এক.

তোমরা একথা নিশ্চয় জান, এই পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নেবে তার মধ্যে সবচে' ভাল মানুষ হলেন আমাদের নবীজী। তাঁর আলোকময় বদনখানা ছিল চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল। তাঁর কোমল-সুন্দর আচরণে মোমের মত গলে যেত জাতশত্রুরাও। যাঁরা তাঁর কাছে আসতো তাঁরা কখনো ছেড়ে যেতে চাইতো না নবীজীকে। তাঁর কথা-কর্ম ও চরিত্র ছিল যাদুমাখা, মধুময়।

আমাদের নবীজী (সাঃ) যে শুধু সর্বক্ষণ ধর্ম কথাই বলতেন তা কিন্তু নয়। তিনি মাঝে মধ্যে গল্প করতেন। কৌতুক করতেন, রসিকতাও করতেন।

একবার এক বুড়ি এলো নবীজীর দরবারে। বুড়িকে দেখে নবীজী বললেন ঃ 'কোন বুড়ি কিন্তু বেহেশতে যাবে না!' একথা শুনে তো বুড়ি অস্থির। কেঁদে কেঁদে কাহিল। বুড়ির এ হাউমাউ কান্না দেখে নবীজী তাকে সান্ত্বনার-সুরে ডাকলেন। রসিকতার হাসি হেসে বললেন ঃ আরে, তুমি যখন বেহেশতে যাবে তখন কি বুড়ি থাকবে! তখন তো তুমি পূর্ণযৌবনা হয়েই বেহেশতে যাবে।

এ কথা শুনে বুড়িরও হাসি পেল। বলল ও-এই কথা!!

দুই.

নবীজীকে ঘিরে বসে আছে তাঁর প্রিয় সঙ্গীগণ। তোমরা অবশ্যই জান, নবীজীর প্রিয় সঙ্গী কাঁরা? হ্যাঁ, আমরা যাঁদের সাহাবী বলি, তাঁরাই হলেন প্রিয় নবীজীর প্রিয় সঙ্গী! তাঁরা ছিলেন নবীজীর দুর্দিনের বন্ধু। নিজেদের জীবনবাজি রেখে নবীজীকে আগলে রেখেছেন। জীবন দিয়েছেন। কিন্তু নবীজীর গায়ে কোন আঁচড় লাগতে দেননি। কল্পনা করা যায়, তাঁরা কত মহান মানুষ ছিলেন! বলতে পার, তাঁরা যদি সেদিন জীবনের বিনিময়ে নবীজীকে, নবীজীর দীনকে গ্রহণ না করতেন তাহলে হাজার বছর পরে এসেও আমরা আজ ইসলামের আলো পেতাম না। মুক্তির সন্ধান পেতাম না।

আজ নবীজীর চারপাশে সেই মানুষদের-ই একটি জামাত! নবীজী তাঁদেরই একটি গল্প বললেন। বললেন ঃ শোন! বনী ইসরাইলে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেতী, একজন টাকওয়ালা আর অন্যজন অন্ধ। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলেন, তাদের পরীক্ষা করবেন। তাই তাদের কাছে মানুষের বেশে একজন ফিরিশতা পাঠালেন।

ফিরিশতা সর্বপ্রথম শ্বেতী রোগীর কাছে এলেন। এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলতে পার, তোমার সবচে' পছন্দের জিনিস কি?

ঃ সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক! শ্বেতী বলল। সে আরও বলল ঃ দেখুন না, এই শ্বেত রংয়ের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। কেউ আমার কাছে আসতে চায় না। একথা শোনার পর ফিরিশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সারা শরীর সুস্থ! শরীরের ত্বক ঝকঝকে সুন্দর। কোথাও শ্বেতচিহ্ন নেই।

ঃ এবার বল, তোমার সর্বাধিক পছন্দের সম্পদ কি? ফিরিশতা পুনরায় শোধালেন।

ঃ উট! শ্বেতী উত্তর দিল।

ফিরিশতা তাকে একটি গর্ভবতী উট দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ

বরকত দেবেন!

এবার টাকওয়ালার কাছে উপস্থিত হলেন ফিরিশতা। বললেন ঃ আচ্ছা, তোমার সবচে' পছন্দের জিনিস কি? সে বলল ঃ আহা, আমার মাথায় যদি সুন্দর চুল থাকতো তাহলে কত ভাল লাগতো। মানুষ আমাকে 'টাক্কু' বলতো না, ঘৃণা করতো না।

ফিরিশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। হাত বুলাতেই মাথা ভরে গেল চুলে। কী চমৎকার চুল! মাথায় হাত দিয়ে তো সে অবাক। আনন্দে তার নাচতে ইচ্ছে করছে।

ফিরিশতা বললেন ঃ এবার বল, তোমার সবচে' প্রিয় সম্পদ কি?

ঃ গাভী! টাকওয়ালা বলল।

ফিরিশতা তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দিয়ে বরকতের দোয়া করে চলে গেলেন।

সবশেষে এলেন অন্ধের বাড়িতে।

ঃ তোমার সবচে' প্রিয় জিনিসটি কি, বল তো?

অন্ধ বলল ঃ দেখুন না, আমি অন্ধ! কিছুই দেখতে পাই না। তাছাড়া মানুষ আমাকে অন্ধ বলে। আল্লাহ্ যদি আমাকে দৃষ্টি শক্তি দিতেন তাহলে সকলকে দেখতে পারতাম।

ফিরিশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন।

হাত সরাতেই সে সুস্থ! সব কিছু দেখতে পাচ্ছে! কী যে খুশি সে!

ঃ এবার বল কি চাই তোমার?

ঃ একটি বকরী! একটি বকরী হলেই চলবে আমার- অন্ধ বলল।

ফিরিশতা তাকে একটি গর্ভবতী বকরী দিয়ে চলে গেলেন।

তারপর চলে গেল অনেক দিন। উষ্ট্রী বাচ্চা দিল। গাভী ও বকরী বাচ্চা প্রসব করল। সবগুলোতেই বরকত হলো। শুধু বরকতই হলো না! অল্প দিনেই উট, গরু, আর ছাগলে প্রান্তর ভরে উঠল। এখন আর তাদের কোন দুঃখ নেই, অভাব নেই। সকলেই সুখী, সকলেই ধনী।

এখন সময় হয়েছে পরীক্ষার। আল্লাহর আদেশ হলো। ফিরিশতা নেমে এলেন। সেই পূর্বের চেহারা, পূর্বের পোশাক!

প্রথমে এলেন শ্বেতীর কাছে। গিয়ে বললেন ঃ দেখ, আমি একজন মুসাফির! গরিব-মিসকিন। চলতে চলতে সফরের সব সম্বল আমার শেষ হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন পাথেয় নেই। আর তুমি আমার ভরসা। আমি তোমার কাছে ঐ আল্লাহর নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে ভাল রং দান করেছেন। তোমাকে করেছেন উন্নতবর্ণ। আমাকে একটি উট দাও। আমি ওতে চড়ে ঘরে ফিরে যাব।

এ কথা শুনে লোকটি বেশ ধমকের সুরে বলল ঃ দূর হও এখান থেকে! মাথায় আমার কত চাপ। কাঁধে কত দায়িত্ব- সেগুলোই সামাল দিতে পারি না। আবার নতুন ঝামেলা!

ফিরিশতা বিস্ময়ের সুরে বললেন ঃ আমি মনে হয় তোমাকে চিনি। তুমি শ্বেতরোগী ছিলে না? তোমাকে মানুষ ঘৃণা করত! অসহায় নিঃস্ব গরিব ছিলে। আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করলেন, এই বিশাল সম্পদের মালিক করলেন।

ঃ খুব সুন্দর বলছো তো! উপহাসের সুরে বলল লোকটি। আরও বলল ঃ দেখ এই সম্পদ আমাদের বাপ-দাদাদের সূত্রেই পেয়েছি। আমরা কখনোই গরিব ছিলাম না।

ফিরিশতা বললেন ঃ যদি মিথ্যা বলে থাক তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে পূর্বের মত করে দেবেন।

একথা বলে ফিরিশতা চলে গেলেন।

হাজির হলেন টাকওয়ালার কাছে। সেই আগের পোশাকে, আগের আকৃতিতে। বললেন, নিজের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কথা এবং বাড়িতে পৌছার জন্যে একটি গরু চাইলেন। সেও শ্বেতীর মতোই ধমক দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলো। ফিরিশতা তার অতীত দিনের টাক

ও দরিদ্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সে তাতেও মানল না। বরং গরম হয়ে শ্বেতীর মতোই বাপ-দাদার নামে বাহাদুরী ফুটালো।

ফিরিশতা বিদায় নেয়ার সময় বললেন ঃ মনে রেখ, মিথ্যা যদি বলে থাক তাহলে কিন্তু 'যেই সেই' হয়ে যাবে।

সবশেষে এলেন অন্ধের বাড়িতে। এসে বললেন ঃ আমি একজন মুসাফির। আমার সফরের সামান-পত্তর ফুরিয়ে গেছে। এখন আমার ভরসা আল্লাহ আর তুমি। যে মহান মালিক তোমাকে পুনরায় দৃষ্টি দান করেছেন আমি তাঁর নামে তোমার কাছে একটি ছাগল চাই। এতটুকু হলেই আমি আমার ঘরে পৌঁছতে পারব।

সে বলল ঃ সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ তায়ালা আমার প্রতি 'রহম' করেছেন। দয়া করে আমাকে দেখার শক্তি দিয়েছেন। তুমি তাঁর নামে শুধু একটি ছাগল চাইছো! একটি কেন? তোমার যতটি প্রয়োজন নিয়ে যাও! আর যা খুশি রেখে যাও। খোদার কসম, আমি তোমাকে কোন কিছুতেই বাধা দেব না।

ফিরিশতা বললেন ঃ বেশ হয়েছে। আমার ওসবের কিছুই প্রয়োজন নেই। আসল কথা ছিল, তোমাদের তিনজনকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষা হয়ে গেছে। তুমি পাস করেছো। আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর ওরা দুজন অকৃতজ্ঞতার কারণে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে!

এটাই খোদার বিচার। যারা কৃতজ্ঞ হয় তাদের আল্লাহ আরও বাড়িয়ে দেন। আর যারা অকৃতজ্ঞ হয় তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেন! (বুখারী শরীফ)

তিন

আরেক দিনের কথা!

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ এক ছিল বনভূমি এলাকা। সেখানে এক লোক বাস করতো। মজুর ধরনের। সে বসে

আছে আর অমনি শোনতে পেল মেঘের ভেতর থেকে কে যেন কথা বলছে। সে নড়ে-চড়ে উঠল। তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করলো, তাকে লক্ষ্য করেই কে যেন বলছে, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি দাও। তারপর সে দেখল, যে মেঘখণ্ডটি থেকে সে এই আওয়াজ শুনেছে সে মেঘখণ্ডটি আবার চলতে শুরু করেছে, তখন সেও চলল পেছনে পেছনে। কিছু দূর যাবার পর সেই মেঘখণ্ডটি থেকে প্রচুর বৃষ্টি হলো। বৃষ্টি হলো একটি পাথুরে ভূমিতে। বৃষ্টির পানি গলাগলি করে বয়ে চলল একটি ক্ষুদ্র নালা দিয়ে। কলকল ধ্বনি। যেন এক আনন্দ মিছিল। লোকটিও শরীক হয়ে পড়ল সেই মিছিলে। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে দেখল নালাটি একটি বাগানে গিয়ে থেমেছে।

আর এক ব্যক্তি সেই নালা থেকে তার বাগানে পানি সিঞ্চন করছে।

লোকটি এগিয়ে গিয়ে বলল ঃ ভাই, আপনার নাম! সে নাম বলল ঃ কিন্তু সেই নাম-যে নামটি সে মেঘের মধ্য থেকে শুনেছে। তার আর তাজ্জবের শেষ রইল না।

সে বুঝল, এই সেই বাগানের মালিক যার বাগানে পানি দিতে বলেছে।

কিন্তু অপরিচিত এই বনভূমিতে একজন অপরিচিত লোক এসে নাম জিজ্ঞেস করায় মালিকেরও কৌতূহল জাগল।

বলল ঃ ভাই, তুমি কে? কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করছ?

সে বলল, যে মেঘ থেকে এই বৃষ্টি হলো আমি সেই মেঘকে তোমার নাম নিয়ে বলতে শুনেছি ঃ অমুকের বাগানে পানি দাও।

লোকটি বলল ঃ আচ্ছা, তাই!

ঃ হ্যাঁ তাই।

এবার সে বাগানের মালিককে খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা আপনি এমন কী আমল করেন, যে কারণে আল্লাহর কাছে

এতটা প্রিয়, গ্রহণযোগ্য? লোকটি বললেন ঃ জানতেই যখন চাচ্ছ তখন বলছি, শোন-

এই বাগানে যে ফসল ফলে আমি তার সবটাই তিনটি ভাগ করি। এক ভাগ ছেলে-সন্তানকে নিয়ে নিজে খাই। এক ভাগ আল্লাহর পথে দেই আর এক ভাগ এই বাগানেই খরচ করি।

এবার বুঝ, আল্লাহর পথে খরচ করার কী দাম!

চার.

প্রিয় নবীজীর (সাঃ) একটা বরকতময় অভ্যাস ছিল, সকাল বেলা ফজর নামাজ শেষে সাহাবাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং বলতেন ঃ আচ্ছা আজ রাতে তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছো?

কেউ দেখে থাকলে তা নবীজীকে শোনাতেন। নবীজী তার ব্যাখ্যা দিতেন। স্বপ্নের মর্ম বলে দিতেন।

অভ্যাস মাফিক একদিন সকলকেই জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমরা কেউ কোন স্বপ্ন দেখনি? ঃ জী-না ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা কোন স্বপ্ন দেখিনি। এবার নবীজী (সাঃ) বললেন ঃ আমি আজ রাতে একটি বিরাট স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা কি শুনবে?

ঃ অবশ্যই শুনব ইয়া রাসূলাল্লাহ!

নবীজী (সাঃ) বললেন, তাহলে শোন-

আমি দেখলাম, কোত্থেকে যেন দু'জন লোক আমার সামনে হাজির। তারা আমার হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল। আমিও চললাম সাথে, যেতে যেতে হাজির হলাম গিয়ে এক পবিত্র ভূমিতে। গিয়ে দেখি কি (!) একজন লোক মাটিতে বসা। তার পাশেই লোহার একটি চকচকে আংটা হাতে দাঁড়ানো আরেকজন। সে ওই আংটা দিয়ে বসা লোকটির কল্লার এক পার্শ্ব চিরতে চিরতে গ্রীবা পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছে। তারপর আবার দ্বিতীয় পার্শ্ব দ্বিতীয় পার্শ্ব থেকে চিরতে চিরতে প্রথম পার্শ্ব পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম পার্শ্ব

চিরা হচ্ছে। আমারতো তাজ্জবের শেষ নেই। বললাম, এ কি? এমন হচ্ছে কেন? তারা বললেন ঃ সামনে চলুন। চলতে থাকলাম! যেতে যেতে দেখি, একজন লোক শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে বিরাট বড় একটি পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। সে এই শায়িত লোকটির মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে হাতের পাথরটি দিয়ে। পাথার তার মাথায় লেগে দূরে ছিটকে পড়ছে। মাথা হয়ে যাচ্ছে চূর্ণবিচূর্ণ। দাঁড়ানো লোকটি ছোটে যায় পাথরটি কুড়িয়ে আনতে। এসে দেখে মাথা আগের মত ঠিকঠাক। আমি বললাম ঃ এ কি কাণ্ড! তাঁরা বললেন ঃ সামনে চলুন।

এগিয়ে চললাম !

পথে একটি বিরাট গর্ত পড়ল। চুলার মত। গর্তটি ভেতর থেকে বেশ প্রশস্ত। উপরের দিকটা সংকীর্ণ। গর্তে আগুন জ্বলছে। সেখানে পড়ে আছে অসংখ্য নাঙ্গা নারী-পুরুষ। আগুন জ্বলতে জ্বলতে উপরের দিকে উঠছে। আগুনের সাথে ভেসে ওঠছে পতিত নর-নারীরা। আসতে আসতে তারা যখন গর্তের মুখের কিনারায় এসে পৌঁছে এবং বেরিয়ে আসতে চায় তখন আগুন আবার দমে যায়। সাথে সাথে তারাও তলিয়ে যায় সেই আগুনের গর্তে। আমি বললাম ঃ এ কি দশা? তাঁরা বললেন ঃ সামনে চলুন।

আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম।

এবার সামনে পড়ল এক রক্তের নহর। নহরের মাঝখানে একটি লোক দাঁড়ানো। পাড়ে দাঁড়ানো আরেকজন। নহরের তীরে পড়ে আছে প্রচুর পাথর কংকর। নহরের মাঝখানের লোকটি তীরে আসতে চায়। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। কিন্তু নিকটবর্তী হবার পর সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখের উপর এমন জোরে একটি পাথর ছুঁড়ে মারে-পাথরের আঘাতে লোকটি পূর্বের স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সে ওঠে আসার চেষ্টা করতে থাকে আর পাথর খেয়ে পেছনে চলে যেতে বাধ্য হয়।

আমি বললাম ঃ হায় এ কি অবস্থা?

তাঁরা বললেন ঃ সামনে চলুন।

এগুতে থাকলাম!

অনেক দূর গিয়ে দেখলাম একটি বিরাট বৃক্ষ। তার নিচে বসে আছেন একজন বুড়ো মানুষ। তার চারপাশে অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। বৃক্ষের পাশেই আরেকজন লোক বসা। তার সামনে আগুন জ্বলছে। সে বসে বসে আগুন জ্বালিয়ে যাচ্ছে। তারপর তাঁরা দু'জনে ধরে আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন। বৃক্ষের উপরে। যেতে যেতে দেখলাম, বৃক্ষের মাঝখানে বিরাট একটি অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে। দেখতে ভীষণ সুন্দর। তারা আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরে প্রচুর নারী-পুরুষ যুবক-যুবতী ও ছোট ছোট শিশু।

তারা আমাকে ঘর থেকে বের করে আরও উপরে তুলে নিলেন।

আমি গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখি আরেকটি অট্টালিকা। আগেরটির চাইতেও সুন্দর। অনেক সুন্দর। সেখানে অনেক বৃদ্ধ ও যুবকের বাস।

আমি এখন ক্লান্ত। বললাম ঃ আচ্ছা আপনারা আমাকে সারা রাত ঘুরালেন। কত কিছু দেখালেন। কিন্তু আমিতো এসবের মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝলাম না! আমাকে খুলে বলুন - এসবের রহস্য কি?

তাঁরা বললেন ঃ তাহলে শুনুন! প্রথমে যে ব্যক্তির কল্লা লোহার আংটা দিয়ে চিরতে দেখেছেন সে হলো একটি মিথ্যাবাদী। দুনিয়াতে সে মিথ্যা কথা বলে বেড়াতো। আর সে কথা সারা দুনিয়ায় সত্যের মতো ছড়িয়ে পড়তো। তার এই শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

আর যার মাথা চূর্ণ হতে দেখেছেন- সে হলো কুরআনের আলেম। আল্লাহ তাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু সে রাতের বেলা নিঝুম ঘুমে পড়ে থাকতো। আর দিনের বেলাও সেমতে আমল করতো না। তার এই শাস্তিও কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

অগ্নিগর্ভে যাদেরকে দেখেছেন তারা হলো ব্যভিচারী দল। রক্তের নহরে অবগাহনকারী লোকটি হলো সুদখোর। আর গাছের নিচে যাঁকে দেখেছেন তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। তাঁর চারপাশে যেসব শিশু দেখেছেন তারা হলো মুসলমানদের শিশু সন্তান যারা বড়ো হবার আগেই মারা গেছে। হ্যাঁ, আগুন জ্বালাতে দেখলেন যাকে তিনি হলেন, জাহান্নামের মালিক দারোগা।

প্রথম যে ঘরটিতে ঢুকলেন সেটা হলো সাধারণ মুসলমানদের বেহেশত। দ্বিতীয়টি হলো শহীদদের ঠিকানা!

আর আমাদের পরিচয়!

ইনি মিকাইল আর আমি জিবরাইল।

তারপর বললেন ঃ একটু উপরের দিকে দেখুন!

আমি তাকালাম! দেখি এক খণ্ড শুভ্র মেঘ!

তাঁরা বললেন ঃ এটাই আপনার ঘর। আমি বললাম ঃ আমাকে ছেড়ে দাও! আমি আমার ঘরে যাব! তারা বললেন, এখনও সময় হয়নি। বয়স পূর্ণ হোক। তারপর যাবেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ও-হ্যাঁ! তোমাদের তো বলা হয়নি! নবী-রাসূলগণও আমাদের মতো মানুষ। কিন্তু মানুষ হয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের থেকে আলাদা। এই স্বপ্নের কথাই ধরো, আমরা আবোল তাবোল কত্তো স্বপ্ন দেখি। কিন্তু নবীগণ কোন বাজে স্বপ্ন দেখেন না। কারণ তাঁদেরকে শয়নে-জাগরণে কোন অবস্থাতেই শয়তান আক্রান্ত করতে পারে না। তাই তাঁরা স্বপ্নে যা দেখেন তাও বাস্তব। পুরোপুরি সত্য।

এতক্ষণ যে বিশাল স্বপ্নের কথা শুনলে এটা হলো পরকালের একটি বাস্তব চিত্র। মানুষ কি পাপ করলে কি শাস্তি পাবে তার একটা চিত্র স্বপ্নের ঘরে তুলে ধরা হয়েছে নবীজীর সামনে। তিনি আবার শুনিয়ে দিয়েছেন অন্য সকলকে। যেন সকলেই এ সব পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং পরকালের ভীষণ-কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পায়। অতএব, একথা আমাদেরও মনে রাখতে হবে কিন্তু!!

এই আমাদের শাসক

এক.

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযিঃ)। তোমরা সকলেই তাঁর নাম শুনে থাকবে । একথাও শুনেছ, উমরের যুগে মুসলিমবিশ্বের সবখানেই ছিল শান্তি, নিরাপত্তা ও বিজয়ের উত্তেজনা। বিশেষ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর (রাঃ) যে উপমা সৃষ্টি করেছিলেন সে কথা এই যুগের জাত শত্রুরা পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারছে না। তাঁর সেই অসাধারণ ইনসাফের কথাই বলি -

এক বুড়ি! থাকেন এক ঝুপড়িতে। তাও আজকালের চট কিংবা ছনের ঝুপড়ি নয়। বরং পতিত সুতা আর ছেঁড়া কাপড়–চোপড় জড়ো করে তৈরী করেছে বুড়ি তার এই ঝুপড়ি। সে যাই হোক। বুড়ি যত গরীবই হোন না কেন উমরের দৃষ্টিতে তিনি একজন সম্মানিত নাগরিক। তাঁর খোজ–খবর নেয়া উমরের কর্তব্য। তাছাড়া খলিফা উমর যদি অন্যায় কিছু করেন তাহলে সেকথা বলারও অধিকার এই বুড়ির আছে।

উমর বুড়ির ঘরে গেলেন। তাঁর খুব কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন ঃ

ঃ বুড়ি মা! বলতো উমর কেমন মানুষ ?

ঃ উমর! আল্লাহ তার অকল্যাণ করুন! কতদিন হলো রাজা হয়েছে আজ অবধি আমার কোন খবরই নিল না!

বুড়ি তো আর জানে না, এটাই হযরত উমর (রাযিঃ)।

তাই উমর (রাযিঃ) সবিনয় শুধালেন—

ঃ আচ্ছা, তোমার যে এ অবস্থা, ভীষণ অভাবে পড়ে আছ— এটা কি উমর জানেন ?

একথা শুনে বুড়ি ভীষণ ক্ষিপ্ত হলেন। বললেন ঃ আমি জানি না, একজন মানুষ জনগণের হাল–অবস্থা কিছুই জানে না আবার সেই তাদের বাদশাহ! এটা কেমন কথা!

একথা শুনে উমর (রাযিঃ) আর স্থির থাকতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং নিজেই নিজেকে বললেন—

দেখ উমর! দুনিয়ার সকলেই তোমার চাইতে ভাল বোঝে। এমনকি এই বুড়ো মহিলাটি পর্যন্ত!

উমর বুড়ির কাছে ক্ষমা চাইলেন। অনেকগুলো মুদ্রা দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন।

একেই তো বলে শাসক!

দুই.

একবারের ঘটনা! তখন মদীনায় ছিল দুর্ভিক্ষ! ক্ষেতে ফসল নেই। বাজারে খাদ্য নেই।দোকান-পাট সব শূন্য। মদীনার সর্বত্রই হাহাকার! খাদ্যের অভাবে জীবন সবার যায় যায় অবস্থা। যারা বিত্তবান তাদের হাতে পয়সা আছে কিন্তু বাজারে খাবার নেই। সুতরাং পয়সা দিয়ে কি হবে!

হযরত উসমান (রাযিঃ) তখন মদীনার একজন ধনী ব্যবসায়ী। সংবাদ এলো, উসমানের খাদ্যবোঝাই বাণিজ্য কাফেলা মদীনার কাছে এসে পৌছেছে প্রায়।সংবাদ পেতেই সকল ব্যবসায়ী হুমড়ি খেয়ে পড়ল হযরত উসমানের বাড়িতে। সেকি প্রচণ্ড ভীড়!

তারা এসে বলল ঃ উসমান! আপনার খাদ্যভাণ্ডার আমাদের কাছে বিক্রি করে ফেলুন। আমরা আপনাকে উপযুক্ত মুনাফা দেব।

উসমান দেখলেন উত্তেজনায় তারা অস্থির । মদীনার মুসলমানগণও পলকহীন তাকিয়ে আছে কাফেলার প্রতি। ক্ষুধার

যন্ত্রাণায় তারা কাতর। শিশুদের মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়।

উসমান (রাযিঃ) বললেন ঃ তোমরা কত লাভ দিবে ?

তারা বলল ঃ দ্বিগুণ দাম দেব আমরা।

উসমান বললেন ঃ তারপর -

তারা বলল ঃ তিনগুণ-

উসমান বললেন ঃ তারপর-

তারা বলল ঃ চারগুণ ।-

তিনি জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন আর তারা দাম বাড়িয়ে চলছে। বাড়তে বাড়তে দশগুণ। এবার তারা হাঁপিয়ে উঠল। বলল ঃ দশগুণ তাও দেবেন না! তাহলে কত দিতে হবে, আপনিই বলুন!

উসমান বললেন ঃ আমি এই খাদ্যভাণ্ডার তোমাদের কাছে বেচবো না। এগুলো মদীনার অসহায় মুসলমানদের জন্যে সদকা!

তিন.

হুরমুয ইবনে কিসরা! পারস্যের বাদশাহ। ন্যায় ও ইনসাফের বাদশাহ। অসহায় দুর্বলের পক্ষ হয়ে সবলের প্রতিশোধ নিতেন । তাঁর দেশে কোন উঁচু মানুষ নীচু মানুষের প্রতি হাত বাড়াতে সাহস পেত না। এমন কি রাজপরিবারের সদস্যরাও না।

তারপরও তাঁর মনে ভয়। আচ্ছা এমন মানুষও তো আছে যে অত্যাচারিত হয় কিন্তু আমার দরবার পর্যন্ত আসতে পারে না। বিচার চাইতে পারে না। তাদের জন্যে কি করা যায়।

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটি উপায় স্থির করলেন। রাজপ্রাসাদের বাইরে একটি বাক্স ঝুলিয়ে দিলেন। আর দেশময় ঘোষণা করে দিলেন - কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে যেন এক টুকরা কাগজে লিখে এনে এই বাক্সে রেখে যায় ।

তারপর তিনি নিজে এই বাক্স খুলতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু এতেও তাঁর চিন্তা দূর হলো না। কারণ, যারা লেখতে জানে না, তারা কি করবে? অবশেষে তিনি প্রাসাদের বড় ফটকের

সামনে একটি শিকল ঝুলিয়ে দিলেন । যার শেষ প্রান্তে একটি বেল লাগানো আছে। এই শিকল ধরে বাইরে থেকে নাড়া দিলে বাদশাহ'র দরবারে ঘণ্টা বেজে ওঠে। তখন তিনি লোক পাঠিয়ে সেই অত্যাচারিতকে ডেকে নিতেন দরবারে। শুনতেন তার অভিযোগ।

এক দিনের ঘটনা।

একটি গাধা যাচ্ছিল প্রাসাদের সম্মুখ পথ দিয়ে। মাথা উঁচু করে নাড়া দিলো শিকল। বেজে উঠল ঘণ্টা। বাদশাহ্ দরবারে সমাসীন। রক্ষী পাঠালেন। ডেকে নিয়ে আস- কে এই মজলুম।

রক্ষী ফিরে গিয়ে বলল ঃ

ঃ একটি গাধা- মহামান্য বাদশাহ! কোন মানুষ সেখানে নেই।

ঃ গাধাটিই ধরে নিয়ে এসো! আদেশ দিলেন বাদশাহ্। আদেশমাফিক ধরে আনা হলো।

বাদশাহ্ গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন গাধাটির প্রতি। নেহাৎ শীর্ণ, দুর্বল তার দেহ।

ঃ এর মালিককে ডাকো। আদেশ দিলেন।

ডাকা হলো মালিককে।

শুধালেন, এই গাধাটি কি তোমার ?

ঃ জী, আমার।

ঃ একে ঠিকমত খাবার দেয়া হয় না কেন? অথচ এর উপর সওয়ার হও, এর উপর সামান পত্তর বহন কর! এটা কি ঠিক? সারাদিন খাটাবে তারপর ছেড়ে দিবে শূন্য পথে আর সে ক্ষুধার তাড়নায় পথে পথে ঘুরে ফিরবে।

লোকটি অন্যায় স্বীকার করলো।

বাদশাহ্ বললেন ঃ গাধাটি নিয়ে যাও। তার শক্তির বাইরে কাজ করাবে না এবং ঠিকমত খেতে দিবে।

এঁরা হলেন বাদশাহ ! মানুষের বাদশাহ!

অন্য রকম ব্যবসা

হযরত আলী (রাযিঃ)!

তোমরা সকলেই তাকে চেন! আমাদের নবীজীর (সাঃ) জামাতা। হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন (রাঃ) এর বাবা! এবার ভাব, কত দামী পরিবার এটা! অথচ এই সোনার সংসারের সর্বত্র জ্বলজ্বল করে সর্বদা অভাবের চেরাগ। দিন যায় রাত আসে। কিন্তু চুলোয় আগুন জ্বলে না।

আজ তিন দিন হলো, হযরত ফাতিমা (রাঃ) চুলোয় আগুন ধরাতে পারছেন না। সোনামুখ হাসান-হুসাইন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যেন মরিমরি। কী করবেন ফাতিমা ভেবে পাচ্ছেন না। অবশেষে তাঁর মনে হলো, আমার না একটা চাদর আছে। ওটা বিক্রি করে দিলেও তো কিছু খাবার কেনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে চাদরটি এনে তুলে দিলেন হযরত আলীর হাতে। হাসানের বাবার হাতে।

হযরত আলী বাজারে গিয়ে ছয় দিরহাম বিক্রি করলেন চাদরটি। কিন্তু ছয় দিরহাম হাতে নিয়ে যেই খাবার কিনতে যাবেন, দেখেন- আহা, কত ভিক্ষুক পড়ে আছে। যেন হাড়গুলো তাদের মাথা উচু করে কথা বলছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বলছে। বলছে, কত দিন হলো খাইনা আমরা! আচ্ছা, আলীর জন্যে কি সম্ভব, ওদেরকে উপোস রেখে নিজের ঘরে খাবার নিয়ে আসা! তাছাড়া ওরাতো হাত পেতেছে। তাও আল্লাহর নামে। না! ওদেরকে না বলা যাবে না।

অবশেষে সবকটি দিরহাম বণ্টন করে দিয়ে খালি হাতে রওনা হলেন বাড়ির দিকে!

তোমরাই বল, আল্লাহর অসহায় বান্দাদের প্রতি যাঁর এত দরদ আল্লাহ কি তাঁকে ক্ষুধায় কষ্ট করতে দেবেন ? কেন দেবেন, আল্লাহর কি অভাব আছে ? তাই আল্লাহর আদেশে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ছুটে এলেন হযরত আলীর খেদমতে। তার সাথে একটি উট। মানুষরূপী ফিরিশতাকে দেখে আলী (রাঃ) বললেন : কে ভাই তুমি ?

ঃ আমি একজন মুসাফির! উটটি বিক্রি করব! হাসানের বাবা আপনি কিনবেন!

ঃ না, আমার কাছে অত পয়সা কোথায়?

ঃ বাকীতেই দেব। বিক্রি করে টাকা দেবেন!

ঃ তাহলে নিতে পারি!

এবার উট নিয়ে চললেন বাজারের দিকে।

সাথে সাক্ষাৎ হযরত মিকাঈল ফিরিশতার সাথে। তিনিও এসেছেন আল্লাহর আদেশে। মানুষের বেশ ধরে। খানিকটা হাসির ভাব ফুটিয়ে একান্ত পরিচিতের মত বললেন -

ঃ হাসানের বাবা! উটটি কি বিক্রি করবেন?

ঃ হ্যাঁ, বিক্রি করব!

ঃ তা কিনেছেন কত দিয়ে?

ঃ একশ' দিরহাম দিয়ে!

ঃ আমি আপনাকে ষাট দিরহাম লাভ দিচ্ছি।

ঃ দিন, আমি রাজী আছি!

একশ' ষাট দিরহাম নিয়ে ফিরেছেন আলী (রাঃ)! কিছু দূর এগুতেই আবার সেই প্রথম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ!

ঃ হাসানের বাবা, উট বিক্রি করেছেন?

ঃ জী, করেছি!

ঃ কত?

ঃ একশ' ষাট দিরহাম!

ঃ তাহলে আমাকে আমার উটের দাম দিন! একশ দিরহাম!

ঃ জ্বী, এই নিন একশ দিরহাম!

তারপর ষাট দিরহাম হাতে সোজা ঘরে চলে এলেন আলী! হাতে তুলে দিলেন ফাতিমার। ফাতিমার তো কপালে চোখ!

ঃ এত্তোগুলো দিরহাম! পেলেন কোথায় শুনি!

ঃ ব্যবসা করেছি!

ঃ কিসের ব্যবসা!

ঃ আল্লাহ্র সাথে ব্যবসা করেছি! ছয় দিরহাম দিয়ে ব্যবসা করেছি। তিনি আমাকে ষাট দিরহাম দিয়েছেন! প্রতি এক দিরহামে দশ দিরহাম।

তারপর হযরত আলী (রাঃ) এসে ঘটনাটি নবীজী (সাঃ)কে শোনলেন। নবীজী (সাঃ) সব শুনে বললেন ঃ আলী! প্রথম যে ব্যক্তি তোমার কাছে উট বিক্রি করেছেন তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। আর যিনি তোমার কাছ থেকে উট খরিদ করেছেন তিনি হলেন হযরত মিকাঈল (আঃ)

এবার বুঝ, আল্লাহ্র নামে দান করার কী মূল্য!

দরবেশ তো নয়; বাঘের বাচ্চা

বিসরের বিখ্যাত শহর 'ইস্কান্দরিয়া' অবরোধ করেছেন সিংহশাবক হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাযিঃ)। দিনের পর দিন যাচ্ছে, কোন সমাধান হচ্ছে না।

এক দিনের ঘটনা। হযরত উবাদাহ (রাযিঃ) বিশেষ কোন কাজে সেনা ছাউনি ছেড়ে বাইরে এলেন। বেশকিছুটা দূরেই। একান্ত প্রয়োজনে। কিছুদূর যাবার পর ঘোড়া থেকে নেমে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন! অতঃপর একাগ্রচিত্তে নামায!

ইত্যবসরে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল কয়েকজন রুমক সৈনিক। তারা সকলেই কাফের। হযরত উবাদাহকে এভাবে একাকী গভীর ধ্যানমগ্নতায় নামাযরত দেখে তারা চিন্তা করল- এই তো সুযোগ! শেষ করে দেয়া যায়! কুমতলবে ধীর কদমে তারা এগুতে লাগল!

তারা আসতে আসতে যখন একেবারে নিকটে চলে এসেছে তখন তিনি বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন এবং চট্ করে সালাম ফিরিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে রুমকদের উপর হামলা করে বসলেন! তারা তো স্বপ্নেও ভাবেনি, এই নিভৃত দরবেশ এভাবে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই তারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল এবং ঘোড়া ফিরিয়ে ভোঁ ছুট! কিন্তু শিকার হাতের কাছে পেলে কি বাঘ সহসাই ছেড়ে

দেয়! উবাদাহ্ ছুটলেন পিছু পিছু। একদল শেয়ালকে এক তেজদীপ্ত বাঘ ধাওয়া করে চলছে! বেশ রোমাঞ্চকর সেই দৃশ্য!

অবশেষে বেদিশা হয়ে পড়ল ভীরু সৈন্যদল। কী করা যায় এখন। এ যে আমাদের খুন না করে ছাড়বে না। তখন তারা নিজেদের সঙ্গে রাখা মূল্যবান অনেক ব্যবহার সামগ্রী ছুঁড়ে মারতে লাগল। উদ্দেশ্য, দরবেশ যেন ওসব কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আর এই ফাঁকে জীবন বাঁচাই।

নবীজীর দরবারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক! পৃথিবীর কোনকিছুর প্রতি কি তাদের লোভ থাকতে পারে? তিনি চোখ তুলে তাকালেনও না সেদিকে। ছুটতে ছুটতে তারা খুব কষ্টে গিয়ে কেল্লার ভেতর ঢুকে পড়ল এবং দরজা বন্ধ করে দিল। হযরত উবাদাহ্ (রাযিঃ) কয়েকটি পাথর ছুঁড়ে মেরে ফিরে আসলেন আপন জায়গায়। আসার পথে রুমকদের ছুঁড়ে মারা সামান-পত্তরগুলোও দেখলেন। বেশ মূল্যবান। কিন্তু দুনিয়ার ওসব নস্যি কুড়িয়ে কি সময় নষ্ট করা যায়? তিনি তাঁর জায়গায় এসে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন!

কিছুক্ষণ পর রুমকরা পুনরায় এসে দেখল, তাদের সম্পদ যথাস্থানে পড়ে আছে। তারা তাদের ধন-রত্ন কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। এবার দেখ, আমাদের পূর্বসূরিরা কেমন ছিলেন!!

(তারাশে-৪০ পৃ.)
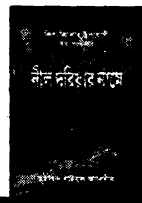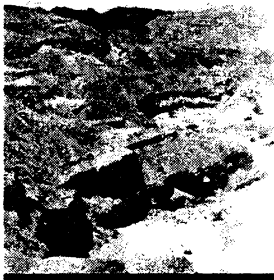
ইসমে আযম

তখনকার পৃথিবীটা ছিল অন্য রকম!

উড়োজাহাজ আর বিমান?

না, সেকালে বাস গাড়ি পর্যন্ত ছিল না। এমন কি পায়ে চালিত সাইকেলও না! জীবনযুদ্ধে মানুষকে কতো কষ্ট করতে হতো! পায়ে হেঁটে পারি দিতে হতো কত দূর দূরান্তের পথ!

এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা!

সেকালে যারা বিত্তবান ছিল তাদের থাকতো জোড়ায় জোড়ায় উট আর ঘোড়াশালায় ঘোড়া! ওই উট আর ঘোড়ায় চরেই তারা দেশ-বিদেশে ঘুরে ফিরতো। ব্যবসা-বাণিজ্যও করতো ওই ঘোড়ায় চরেই। সেই এক উটসওয়ার বণিকের কথাই শোন!

তিনি এক সৎ ব্যবসায়ী!

মাঝে মধ্যেই বাণিজ্যে বের হোন! বিরাট কাফেলার সাথে! এবং এটা ছিল সেকালের নিয়মিত রেওয়াজ। বণিকরা দল বেঁধে বাণিজ্যে বের হতো! মরুভূমির চিক্‌চিকে বালি বিছানো রূপালী প্রান্তর পাড়ি দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যেত সারি সারি উট! চাঁদনী রাতের রূপালী জ্যোৎনা, আকাশ ভরা ঢেউ তোলা আলোর শীতল শামিয়ানার ছায়ায় রাত জেগে গাইতো বণিকরা আরব ঐতিহ্যের গীত! বড়ই মনোরম সেই দৃশ্য!

কিন্তু এবার হলো কি!

কাফেলার লাগ পেলেন না এই বণিক!

তাই বলে কি ঘরে বসে থাকবেন ? না, সাহস করে একাই রওনা হয়ে গেলেন। সোজা সিরিয়ার পথে! সেকালে সিরিয়া ছিল বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র।

তিনি আমাদের প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সাহাবী! সিরিয়া থেকে উটবোঝাই মাল পত্র কিনে সোজা চলে আসেন মদীনায়। নবীজীর শহরে! বিক্রি করেন মদীনার বাজারে। এখানকার বাণিজ্যের স্বাদ-ই ভিন্ন! নবীজী শহর না!!

সিরিয়া থেকে মাল-পত্র কিনে পথ ধরলেন মদীনার! কত রাত কত দিন পথে কাটবে তাঁর! আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠের পরে মাঠ! যত দূর চোখ যায় শুধু ধু ধু বালির ঢেউতোলা বিরস চিত্র। কোথাও এক ফোটা সবুজের সাক্ষাৎ নেই! তার উপর মরু পর্বতের তামাটে গুহায় লুকিয়ে থাকা দস্যু-ডাকাতের ভয়! সঙ্গী-সাথী কেউ নেই! বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপছে! যদি পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে একমাত্র আল্লাহ-ই ভরসা!

শুধু মুখেই নয়!

শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন সেই আল্লাহ নামের জপ!

আচ্ছা, এমন কঠিন সময়ে আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে শুনি! একথাটা আমরা অসময়ে স্বীকার করলেও কিন্তু সুসময়ে ভুলে যাই! আর ভুলে যাই বলেই অসময়ে ডেকেও তাঁর সাড়া পাই না!

নবীজীর বণিক সাহাবী বড় সন্ত্রস্ত মনে পথ চলছেন! আচ্ছা, মনের কোথায় লুকিয়ে থাকে এই ভয়গুলো? অসময়ে কোত্থেকে আসে তারা? আসেও যে একেবারে দলে দলে! মনে যেন এখন ভয়ের হাট বসেছে! সমস্ত শরীরটা যেন কেমন বরফ হয়ে আসছে! আর অমনিই বিকট একটি চিৎকার যেন মরুভূমির হাজার বছরের গাঢ় নিদ্রাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিল! ভয়ংকর চিৎকারে কেঁপে ওঠল মুসাফিরের

সমগ্র দেহ! ভয়ে ভয়ে বলল ঃ বাবা মাল-পত্র যা আছে নিয়ে নাও! তবুও আমাকে মেরো না। ডাকাত বলল ঃ ওসব তো আমার-ই! ওগুলো নিতেই তো এলাম। তবে তোমাকেও ছাড়ছিনা!

ঃ কেন ভাই! আমার কি অপরাধ!

ঃ অপরাধ মস্ত বড়ো! তুমি ছুটে যেতে পারলে বলে দিবে আমার আস্তানার কথা। তখন আমার ব্যবসায় লাল বাত জ্বলবে!

ভারি ভাবনায় পড়ে গেল মুসাফির। ভাবল এই কঠিন বিপদে আমাকে কে সাহায্য করতে পারেন! হ্যাঁ, তিনি আমাদের আল্লাহ! সকল ক্ষমতার মালিক! এ কথা চিন্তা করে বললেন —

ঃ আচ্ছা, ভাই! আমাকে মেরেই যখন ফেলবে তার আগে দু' রাকাত নামায পড়তে দেবে? খু-ব অল্প সময় লাগবে!

ঃ পড়তে যখন চাও, পড়! তবে খু-ব দ্রুত! অপেক্ষা আমার একদম সহ্য হয় না!

তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন মহান আল্লাহর সামনে! অশেষ ভক্তি প্রেম আর এক দরিয়া আবেগ ঢেলে দিয়ে আদায় করলেন দু' রাকাত নামায! তারপর মহান মালিকের দরবারে দুটো হাত তুলে আরয করলেন -

'ওগো প্রেমময়, ওগো দয়াময়! ওগো সম্মানিত আরশের অধিপতি! প্রথম সৃষ্টিকর্তা ওগো, ওগো পুনর্জ্জীবনদানকারী! ওগো সকল ক্ষমতার মালিক! আমি তোমার সমীপে তোমার সেই নূরের উসিলা লয়ে ভিক্ষা চাই, যে নূরের আলোয় উদ্ভাসিত তোমার আরশ; তোমার সেই শক্তির উসিলা লয়ে হাত পেতেছি ওগো - যে শক্তিবলে তোমার সমগ্র সৃষ্টির উপর তোমর রাজত্ব; সেই রহমতের ভরসা লয়ে তোমার সকাশে এই মুনাজাত - যে রহমত ছেয়ে আছে তোমার তামাম সৃষ্টি জগৎ! ওগো রক্ষাকারী, রক্ষা কর! ওগো ত্রানকর্তা মুক্তি দাও! ওগো মুক্তিদাতা বাঁচাও! দুআটি তিনবার পাঠ করলেন তিনি! একি! মুনাজাত শেষ হতে না হতেই একটি বিকট চিৎকার!

ঃ বাঁচাও ...

বণিক ফিরে তাকালেন!

হায় খোদা! তোমার একি কুদরত! মাটিতে আপন রক্তের বণ্যায় গড়াগড়ি খাচ্ছে সেই ডাকাত! বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে একটি ক্ষুদ্র বর্শা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে ফেনাতুলে! পাশেই এক অশ্বারোহী মুসাফির! বুঝতে কষ্ট হয় না, কান্ডটি ঘটিয়েছেন এই আগন্তুক মুসাফির! খানিকক্ষণ রা সরল না মুখ থেকে! অবস্থাটা একটু স্বাভাবিক হলে বণিক-ই প্রথম মুখ খুললেন-

ঃ কে ভাই আপনি! কোত্থেকে এসেছেন এই বিপদ মুহূর্তে!?

ঃ আমি ফিরিশতা! আল্লাহর হুকুমে তোমাকে রক্ষা করতে এসেছি? আর শোন! তুমি যখন প্রথমবার তোমার দুআটি পাঠ করলে তখন আমরা ফিরিশতারা আকাশের মধ্যে বিকট একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম! আমরা তখন বলাবলি করলাম ঃ পৃথিবীতে নিশ্চয় কোন বড় রকমের অঘটন ঘটেছে! তারপর যখন দ্বিতীয়বার দুআটি পাঠ করলে তখনও সেই একই ধ্বনিতে আকাশমন্ডলী কেঁপে ওঠল। আমরা সকলেই তটস্থ হয়ে রইলাম। তৃতীয়বার যখন মুনাজাতটি করলে তখন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো -

'কে আছ এই লোকটিকে বাঁচাবার?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে আরয করলাম -

ঃ আমাকে অনুমতি দিন - হে প্রভু!

অনুমতি পেলাম! মুহূর্তে ছুটে এলাম। তারপর যা ঘটলো তাতো তোমার সামনেই।

ঘটনা শুনে প্রভু দয়াময়ের প্রতি অসীম শুকরিয়ায় ভরে উঠল বণিকের মন! মাথা যেন নুয়ে পড়ছে গভীর কৃতজ্ঞতায়!

এবার পথ চলতে শুরু করলেন নির্বিঘ্নে! এখন পথ-ঘাট গুলো যেন কেমন মুক্ত মনে হয়। শরীরটা মনে হয় বাতাসের মত হালকা! আচ্ছা, একটু আগে না শরীরটা পাথরের মত ভারি মনে হচ্ছিল! সুখ-

দুঃখে কি শরীরের ওজন তাহলে বাড়ে কমে ? বিষয়টি শরীর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখতে পারেন!

উট বোঝাই মাল-পত্র নিয়ে তিনি এখন মদীনায়!

নবীজীর একেবারে কদম মুবারকের কাছে! যেন সন্তান বিপদের বহু পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে দয়ার্দ্র পিতার কাছে এসে পৌঁছেছে। সঞ্চিত আবেগ ও সুরভিত বিশ্বাসের কণ্ঠে সব কথা বললেন নবীজীকে! নবীজী (সাঃ) সব শোনে বললেন 'এতো ইসমে আযম! তোমাকে এই দুআ আল্লাই শিখিয়ে দিয়েছেন! আর শোন! ভবিষ্যতে কেউ যদি কখনো বিপদে পড়ে তোমার এই দুআ পাঠ করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে - তাহলে তিনি অবশ্যই সাড়া দেবেন।'

অবশ্য সেই সাড়া পেতে হলে নিজের ভেতরে থাকতে হবে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমময় আস্থা ও গভীর বিশ্বাসের ধন ।

কিশোর ওলী

অনেক দিন আগের কথা।

তখন ছিল হিজরী তৃতীয় শতাব্দী। এই শতাব্দীর এক মহান বুযুর্গ। নাম তাঁর সাওবান। বাবা ইবরাহীম প্রিয় দুলালের নাম সাওবান রাখলেও জগৎ জুড়ে তাঁর পরিচয় 'যিন্-নূন' নামে। আর তিনি ছিলেন মিসরের অধিবাসী। তাই সকলেই তাঁকে যিন্-নূন মিসরী' বলে ডাকে।

কিন্তু তোমরা শোনে আশ্চর্য হবে, পৃথিবী বিখ্যাত এই ওলী এক সময় জীবিকা নির্বাহ করতো মাছ ধরে। হ্যাঁ, আরবীতে 'নূন' শব্দের অর্থ মাছ। আর যিন্-নূন অর্থ মাছওয়ালা।

আসলে ইসলামে কোন পেশাকেই ছোট করে দেখা হয় না। বরং ইসলাম বলে এক আদমের সন্তান হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান। আর জীবিকার জন্যে যারা চুরি করে ডাকাতি করে তারা খুব খারাপ মানুষ। এবং খারাপ মানুষ তারা যারা সুদ খায়, ঘুষ খায়। আর যারা নিজ হাতে কাজ করে খায় তারা খুব ভাল মানুষ। তাদের কামাই করা পয়সা খুবই পবিত্র। এই জন্যেই দেখ, পৃথিবীর এক বিখ্যাত ওলী জীবিকার জন্যে মাছ ধরছেন!

এক দিন হলো কি জানো!

যিন্-নূন গেছেন সমুদ্রে মাছ ধরতে। সঙ্গে নিয়েছেন তাঁর এইটুকু ছোট্ট মেয়েটিকে। আদরের দুলালী বাবার সঙ্গে যাবে বলে আবদার করেছিল হয়তো!

যিন্-নূন জাল ফেলেছেন। মনে মনে আশার জাল বুনছেন! যদি একটি বড় মাছ পেয়ে যাই তবেই হলো! তারপর অপেক্ষা!

কিছুক্ষণ পর জাল তুলতে শুরু করলেন যিন-নূন

আর মেয়েটি! ছোট ছোট নরোম-কোমল আঙ্গুলগুলো বুলিয়া যাচ্ছে জালের উপর।অনাবিল দৃষ্টিতে দেখছে, মাছ কি তাহলে ওঠেনি? হ্যাঁ ওইতো চিক চিক করছে ...

যিন্-নূনের দৃষ্টিও এখন মাছটির প্রতি। সারা দিনের রোজগার! মেয়েটি জাল টিপে টিপে মাছটা হাতের মধ্যে নিয়ে এলো! তারপর অনেকক্ষন দেখল মাছটি। পরখ করার দৃষ্টিতে। যেন জহুরী মনি-মুক্তা পরখ করছে। তারপর আস্তে করে দরিয়ায় ছেড়ে দিল মাছটি!

বাবা তো অবাক!

ঃ মা, মাছটি ছেড়ে দিলে ?

ঃ ছেড়ে দিলাম বাবা!

ঃ কেন মা! সারা দিনের রোজগার!

ঃ দেখ বাবা, মাছটি না ঠোঁট নেড়ে আল্লাহকে ডাকছিল। ও ডাকছে আল্লাহকে। আর আমরা ওকে খেয়ে ফেলব, এটা কি ঠিক হবে, বাবা!

ঃ তাহলে আমাদের উপায় কি হবে মা?

ঃ বাবা, আল্লাহর যিকির করে এমন কিছু খাব না! আর উপায় আল্লাহ্ এটা করেই দিবেন! আল্লাহ’র কাছেতো কোন অভাব নেই।

ঃ আচ্ছা, তাহলে তাই হোক!

বাবা মেয়ে মাছ শিকার ছেড়ে দিলেন! অন্তর ভরা বিশ্বাস, ব্যবস্থা আল্লাহ্ একটা করবেন!

আচ্ছা, তোমরাই বল - আল্লাহর প্রতি যাদের এমন গভীর বিশ্বাস আল্লাহ্ কি তাদের ভুলে থাকতে পারেন! আল্লাহকে যারা এতটা কাছের মনে করেন আল্লাহ্ কি তাদের দূরে রাখতে পারেন! পারেন না! তাদেরকে তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্টও দিতে পারেন না!

সারাটা দিন কেটে গেল!

তবুও বিরক্তি নেই! ব্যবস্থা আল্লাহ্ একটা করবেন!

আচ্ছা, আল্লাহ যদি ব্যবস্থা করেনই সেটা কি সাধারণ ব্যবস্থা হবে? না, সেটা হবে অলৌকিক কিছু। আর হলোও তাই!

যখন রাত হলো, সময় হলো রাতের খাবারের - তখন যিন্-নূন দেখেন কি, সামনে ইয়া বড় একটি 'দস্তর খান'। কত রঙের খাবার সাজানো তাতে! আহা, কী যে গন্ধ! এই গন্ধ শোঁকেই যেন হাজার বছর থাকা যায়! গন্ধ তো হবেই! আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন না! এটা কি সাধারণ খাবার! তারপর প্রতি রাতেই হাজির হতো এই খাবার বোঝাই খাঞ্চা। নানা রঙের খাবার থাকতো তাতে। স্বাদে গন্ধে-তৃপ্তিতে সে খানার কোন উপমা হয় না।

যিন্-নূন ভাবলেন তাঁর নামায-রোযার বরকতেই বুঝি এই দান। কিন্তু যখন তার এই আদরের দুলালীর মৃত্যু হলো তখন থেকে আর সেই গায়বী দস্তরখানের দেখা নেই। তখন বুঝলেন - এটা ছিল সেই কিশোরী ওলীর বরকত!

কি বুঝলে ?

ছোটরাও ওলী হতে পারে - তাই না!
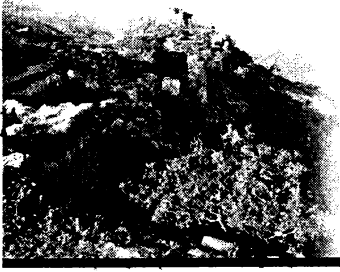
ইবলীসের ফাঁদ

একটা সময় ছিল যখন সমাজে সচেতন মানুষ ছিল খুব কম। অভাব ছিল জ্ঞানী মানুষের, গুনী মানুষের। মানুষের মধ্যে ভাগাভাগিটা ছিল খুবই প্রবল। ধনী-গরীবে ভাগ; সাদা-কালোয় ভাগ; শাসক-শাসিতে ভাগ। তাই রাজা মারা গেলে তার আসনে বসতো তারই পুত্র। রাজার ছেলে রাজা হবে এটাই যেন চূড়ান্ত নিয়ম। এই নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় সাত বছরের নাবালক রাজপুত্রকে পর্যন্ত রাজার আসনে দেখা যেত।

রাজার পুত্র হিসাবে রাজা হলো এক যুবক। কিন্তু রাজ্য শাসনে তার মন বসলো না। কি যেন এক শূন্যতা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। তখন একদিন তার সভাসদকে ডেকে মনের অবস্থা বর্ণনা করল। বলল ঃ আচ্ছা, অন্যদের অবস্থাও কি আমার মতোই। তারা বলল ঃ না। সকলের অবস্থা তো বরং উল্টো। তারাতো এ কাজে বেশ মজা বোধ করে।

ঃ তাহলে আমাকে পরামর্শ দিন। কী করতে পারি!

ঃ আপনি বরং আলিম-উলামা পীর-বুযুর্গের পরামর্শ নিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ দেশের পীর-বুযুর্গ আলিম-উলামাকে সংবাদ দিন তাহলে!

ডাকা হলো সবিনয়ে সকল শ্রেণীর উচ্চস্থানীয় আলিম ও বুযুর্গগণকে। রাজা তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আপনারা এখন থেকে

আমার সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা। আমার কাছে থাকবেন। দেশ ও জাতির জন্যে যা কল্যাণকর মনে করবেন আমাকে তাই করতে বলবেন। আর অন্যায় কিছু দেখলে অবশ্যই বাধা দেবেন!

আচ্ছা, তোমরাই বল, আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখের জীবনের মূল লক্ষ্যই তো এটা। মানুষের কল্যাণ কামনা, দেশ ও দশের জন্যে ভাল কিছু করাইতো তাদের মূল স্বপ্ন। সুতরাং তারা কি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? পারেন না!

তারা রীতিমত দরবারে আসেন। রাজাকে ভাল-মন্দ বলে দেন। রাজাও মেনে চলেন তাঁদের পরামর্শ। আর রাজ্যময় বয়ে চলে সুখের পরশ। রাজ্যের কোথাও লড়াই-ঝগড়া নেই। মারা-মারি নেই। ভয়-ভীতি নেই। রাজা খুশী প্রজাদের প্রতি। প্রজারাও খুশী রাজার প্রতি। এভাবে কেটে গেল চারশ' বছর।

তারপর হলো কি জান ?

রাজা ও রাজ্যের এই সুখ দেখে জ্বলে পোড়ে মরতে লাগল একজন। নিশ্চয় জান- সে কে? হুঁ, সে হলো মিস্টার ইবলীস! মানব জাতির আদি শুত্রু সে। তাই মানব জাতির সুখ-শান্তি তার মোটেও সয় না। কিন্তু আলিমগণতো হলেন নবীজীর ওয়ারিশ। নবীজী (সাঃ)কে আল্লাহ তাআলা যে আসমানী জ্ঞান ও বিদ্যা দান করেছেন তাঁরা রাজাকে পরামর্শ দেন সেই জ্ঞানের আলোকে। সেই জ্ঞানে কোন খুঁত নেই। কোন ত্রুটিও নেই। তাই ইবলীস মশায় ভেবে পাচ্ছিল না ফাঁদটি কোথায় পাতবে!

অবশেষে একদিন করল কি! স্বরূপে হাজির হলো রাজার দরবারে। রাজা তো তাকে দেখেই অবাক!

ঃ কে তুমি?

ঃ আমি ইবলীস!

ঃ কিন্তু তুমি কে?

ঃ আমি একজন আদম সন্তান! এই রাজ্যের রাজা!

ঃ না, তুমি আদম সন্তান নও!

ঃ কেন?

ঃ তুমি যদি আদম সন্তান হতে তাহলে বহু পূর্বেই মরে যেতে-যেভাবে আদম সন্তানরা মারা যায়!

ঃ তাহলে আমি কে?

ঃ তুমি নিজেই খোদা! মানুষের উচিত, তোমার ইবাদত করা। অথচ তারা বুঝে না।

বিষয়টি রাজার ভেতরটা উলট-পালট করে দিল। ভাবল কথাটা কি আসলেই ঠিক! তার এই সন্দেহ সংশয় খুব পছন্দ হলো মিস্টার ইবলীসের! ভেতরটাকে আরও শক্ত করে ঝাকুনি দিতে লাগল সে। চোখের সামনে রিপু ও কামনার অসংখ্য দীপ-জ্বালিয়ে ধরল! খোদা হলে তার কত সম্মান ও সুবিধা হবে সবই জাগিয়ে তুলল তার মনের ভেতর!

তোমারই বল, খোদা হতে পারলে আর বান্দা হয়ে থাকে কে?

রাজা হতে পারলে কি কেউ প্রজা হয়ে থাকে?

আর দেরী নয়!

রাজা বিশাল সমাবেশ ডাকলেন! উজীর-নাজীর থেকে আম জনতা পর্যন্ত সকলেই উপস্থিত হলো সেই সমাবেশে। রাজা বিশেষ ভাষণ দেবেন বলে এত বিশাল আয়োজন! অতঃপর তিনি মঞ্চে ওঠে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

'হে লোক সকল!

আমি এতদিন পর্যন্ত তোমাদের কাছে একটি বিষয় গোপন রেখেছিলাম। এখন সেটা বলার সময় এসেছে। তাই তোমাদেরকে ডেকেছি! আশা করি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে!

সকলেই গলা ছেড়ে চিৎকার করে বলল ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করব।

আচ্ছা, চারশ' বছর যিনি পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে রাজ্য শাসন করেছেন, কোন অবিচার করেননি, অত্যাচার করেননি, তাকে কি অবিশ্বাস করা যায়? অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন -

'শোন তাহলে –

আমি যদি তোমাদের মত মানুষ হতাম তাহলে নিশ্চয় মরে যেতাম। কারণ, মানুষ তো এতদিন বাঁচে না! আসলে মানুষ নই; আমিই খোদা! আজ থেকে তোমরা আমারই ইবাদত করবে!'

আল্লাহর এত দয়া ও অনুগ্রহ পেয়ে যার এই দশা তাকে কি ক্ষমা করা যায়? যায় না! তাই মহান আরশের মালিক, বিশ্বজাহানের অধিপতি আল্লাহ ভীষণ রাগ হলেন। এবং সেকালের নবীর প্রতি সংবাদ পাঠালেন ঃ রাজাকে বলে দিন –

'তুমি যতদিন ঠিক ছিলে তোমার রাজ্যকে ততদিন ঠিক রেখেছি আজ তুমি যখন সরে পড়লে তোমার রাজ্যও শেষ। আর আমার ইজ্জতের কসম! আমি তার উপর 'বুখতে নসর' কাফের বাদশাহকে লেলিয়ে দেব।

নবী তাকে সংবাদ জানিয়ে দিলেন! এবং তার কদিন পরই বুখতে নসর বিরাট বাহিনী নিয়ে হামলা করল এবং তার মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে দিল। সত্তর জাহাজ স্বর্ণমূদ্রা লুট করল তার কোষাগার থেকে!

এবার বুঝ, ইবলীস মানুষের কত বড় দুশমন!

তাই সর্বদা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে যেন তিনি আমাদেরকে শয়তানের ফাঁদ থেকে রক্ষা করেন!

হাতেম তাঈ-এর গল্প

এক.

তোমরা হাতেম তাঈ-এর নাম নিশ্চয় শুনেছ! অনেক পুরানো যুগের মানুষ হাতেম তাঈ। আমাদের নবীজীরও আগের যুগের। বলতে পার মূর্খযুগের লোক। কিন্তু তারপরও হাতেম ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁর স্বভাব চরিত্রের কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশংসা করেছেন।

হাতেম তাঈ-এর হৃদয়টা ছিল আকাশের মত বিশাল। মানুষের সুখ-দুঃখ নিজের মত করে দেখতেন তিনি। আর নিজের হাতে যা থাকতো নির্দ্বিধায় বিলিয়ে দিতেন তার সবটুকু। তাই তিনি পৃথিবীতে এখনো 'দাতা' হাতেম তাঈ হিসেবে পরিচিত।

হাতেম তাঈ-এর কাছে কেউ কিছু চেয়েছে আর তিনি তা দেননি এমন ঘটনা শোনা যায় না। এমন কি তিনি যখন দিতেন তখন কেবল দেখতেন যাকে দিচ্ছেন তার প্রয়োজনটুকু। কিন্তু তাঁর নিজের কি হবে, সংসার কিভাবে চলবে ইত্যাকার তুচ্ছ চিন্তাকে কখনোই আশ্রয় দিতেন না তিনি। আর এই অসাধারণ দান ও অনুগ্রহের কারণে আজও তিনি বেঁচে আছেন পৃথিবীময়। তিনি এক রূপকথার নায়ক।

দুই.

হাতেম তাঈ-এর কদর পৃথিবী জোড়া। তাই বলে কেউ চাইলেই কি হাতেম তাঈ হতে পারবে? পারবে না। এমন কি হাতেম তাঈ-এর সহোদরও পারেনি তাঁর মত হতে।

এক দিনের ঘটনা। হাতেম তাঈ-এর ছোট ভাই আড়ি ধরল তার মায়ের সাথে। বলল ঃ মা, আমিও ভাইয়ার মত দাতা হয়ে যাব। তখন সবাই আমার তারিফ করবে। আমারও নামডাক হবে।

মা বললেন ঃ তুমি হাতেমের মত হতে পারবে না। অযথাই কষ্ট করো না।

এ কথায় সে খুব তাজ্জব হলো। বলল ঃ কেন পারবো না মা! আমরা তো একই মায়ের সন্তান। একই মায়ের কোলে বড় হয়েছি। একই পরিবেশে বেড়ে ওঠেছি। আমার ভাই যা পারবে আমি তা পারব না কেন? তুমি দেখ, আমি সত্যি সত্যিই ভাইয়ার মত হয়ে যাবো। তুমিও মানুষের মুখে মুখে আমার প্রশংসা শুনবে। কিন্তু মা বললেন ঃ তুমি অকারণেই অস্থির হচ্ছো! আচ্ছা, সবার দ্বারা কি সব কাজ হয়? তুমি এতটুকু বিশ্বাস রাখো, তুমি হাতেম নও!

ছেলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। বলল ঃ মা, তুমি খুলে বল কেন আমি ভাইয়ার মত হতে পারবো না। মা বললেন ঃ তাহলে শোন- হাতেম যখন দুধের শিশু তখন তার একটি দুধভাই ছিল। একই সাথে তারা দুধ পান করতো। কিন্তু হাতেম কি করতো জানো! তার যখন দুধের তেষ্টা পেতো তখন সে আমার কোলে ওঠে আসতো দুধ পানের জন্যে। কিন্তু তার দুধভাইকে তুলে দুধ না দেয়া পর্যন্ত হাতেম মুখে দুধ নিতো না।

আর তোমার কাণ্ড কি ছিল জান! তোমারও ছিল এক জন দুধভাই। তুমি যখন দুধ পান করতে যেতে আর আশেপাশে তোমার সেই দুধভাইকে দেখতে তখন সে আমার দুধ খেতে আসে কি-না এই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে এবং পুরো পাড়া কাঁপিয়ে তুলতে। তাকে সেখান থেকে বিদায় না করা পর্যন্ত মুখে দুধ নিতে না।

তিন.

এতো ছিল শিশু হাতেম। তারপর হাতেম যখন কিশোর হলো তখনই তাঁর বিশাল মনের বিকাশ ঘটলো এক অনিন্দ্য সুন্দর ঘটনার মাধ্যমে।

হাতেমের বাবা ছিলেন বেশ বড় গেরস্থ। তাদের ছিল প্রচুর উট, ভেড়া, বকরী। একদিন হাতেমের বাবা তাকে ডেকে বললেন ঃ হাতেম, একটু কষ্ট করতে পারবে বাবা? হাতেম সায় দিয়ে বলল ঃ কেন পারব না! অবশ্যই পারব।

বাবা বললেন ঃ উটগুলো একটু মাঠে নিয়ে যাও। আজ কোন চাকর-বাকর ঘরে নেই। হাতেম এমনিতেই ভাল ছেলে। সভ্য-শান্ত। তার উপর বুদ্ধিমানও। তাই তার হাতে কোন বড় দায়িত্ব ছেড়ে দিতেও ভয় নেই।

হাতেম গেলেন। উট-বকরীগুলো ছেড়ে দিলেন মাঠে। ঠিক সেই সময় এই পথে একটি কবি-সাহিত্যিকদের কাফেলা যাচ্ছিল রাজদরবারে। রাজা নু'মান ইবনে মুনযিরের উদ্দেশে যাচ্ছিল তাঁরা। তাঁরা বালক হাতেমকে কাছে ডাকলেন। বললেন ঃ বাপু, আতিথেয়তা করতে পারবে? প্রশ্ন শুনেতো হাতেমের চোখ কপালে! সে বলল ঃ এতগুলো উট-বকরী থাকতে এ প্রশ্ন? আমার কাছে আতিথেয়তা চাচ্ছ!

হাতেম কিন্তু তাদের কাউকে চিনেন না। কিশোর বালক, কি চিনবেন তিনি, তাই বলে অতিথির যত্ন করবে না! অতিথিতো অতিথিই। পরিচিত-অপরিচিতের কোন পার্থক্য এখানে অচল। তাই হাতেম সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে উট জবাই করে দিলেন।

অবাক হয়ো না! এটা আরবদের আতিথেয়তার নিয়ম।

সবাই মিলে যখন খেতে বসলেন তখন হাতেম তাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন, পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। খানা-পিনা শেষ হবার পর যখন তারা বিদায় চাইল তখন অবশিষ্ট উট বকরী ভেড়াগুলো তাদের হাতে তুলে দিলেন উপহারস্বরূপ।

দুপুর গড়িয়ে যখন বিকাল হল, হাতেম তাঈ-এর বাবা মাঠে এলেন উট বকরীগুলো দেখতে। কিন্তু একি! মাঠ শূন্য। হাতেম বসে আছে একাকী। কাছে এসে শুধালেন- উট বকরী কই? হাতেম তখন সহাস্যমুখে বলল ঃ আব্বু, আজ তোমার গলায় সম্মানের এমন মালা পরিয়ে দিয়েছি তা আর কোনদিন ছিঁড়ে পড়বে না। অতঃপর পুরো কাহিনী খুলে বললেন। বাবা তো রেগে আগুন! বললেন ঃ কী, সবগুলো জানোয়ার দিয়ে ফেলেছ? যাও! আমার ঘরে তোমার আর ঠাঁই হবে না। হাতেম বললেন ঃ আব্বু, ওসবকে ভয় করি না আমি। মন্দতো কিছু করিনি।

হ্যাঁ, এভাবেই শুরু হয়েছিল দাতা হাতেমের দান চর্চা।

চার.

আরেক বারের ঘটনা শোন!

হাতেম তাঈ-এর একটি ঘোড়া ছিল। ভীষণ তেজী, সুঠাম এবং সুন্দর চকচকে। তখন তো ঘোড়ার যুগ। ঘোড়ায় চড়ে মানুষ দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াত। ভ্রমণ বিলাস থেকে লড়াই-যুদ্ধ সবই ছিল ঘোড়ার উপর। তাই রাজা-বাদশাহরা যখন শোনতো কোথাও কোন চমৎকার সাহসী ঘোড়া আছে তখন তারা বস্তাবোঝাই মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করতো সেইসব ঘোড়া।

হাতেম তাঈ-এর ঘোড়ার কথাও রাজার কানে গেল। এমন নামী-দামী ঘোড়া! বাদশাহ্ আর দেরি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাকে পাঠালেন। বললেন ঃ হাতেম যা চাইবে তাই দেবো। কিন্তু ঘোড়াটি আমার চাই। কর্মচারী আসলেন হাতেমের বাড়িতে।

হাতেমের বাড়িতে সবাই সমান। এখানে রাজা প্রজা নেই। সকলেই অতিথি। পরিচিত-অপরিচিত সকলেই মেহমান তাঁর

বাড়ির। সুতরাং তাঁর বাড়িতে কেউ আসলে তার পরিচয় জানার প্রয়োজন যেমন তিনি অনুভব করতেন না- কি জন্যে এসেছেন সে কথাও জিজ্ঞেস করার তাগিদ অনুভব করতেন না। তাঁর নিয়ম ছিল, মেহমান এসেছে, বিশ্রাম করবে, খাবে, থাকবে। তার বলার কিছু থাকলে সময় মত বলবে।

কিন্তু আজকের অতিথি এসে পড়েছে একটু অসময়। মেহমানদারী করার মতো ঘরে তেমন কিছুই নেই। আছে শুধু সেই 'খ্যাতিমান' ঘোড়াটি। তাতে কি! ঘোড়ার মূল্য যতই হোক ওটাতো একটা ঘোড়া মাত্র। আর কোন ঘোড়ার মূল্যই তো একজন অতিথির চাইতে বেশি হতে পারে না। বিশেষ করে হাতেম তাঈ-এর বাড়িতে। তাই অতিথির জন্যে সেই ঘোড়াটিই জবাই করা হলো।

রাত হলো! ঘোড়াও রান্না করা হয়েছে। হাতেম নিজেই এসেছেন অতিথির সেবায়। নিজ হাতে খানা-পিনা করালেন। খানা-পিনা শেষে অতিথি বললেন ঃ জনাব, আপনার সাথে যে আমার কিছু কথা ছিল। বেশ জরুরি কথা! হাতেম বললেন ঃ বলুন! তখন সে বলল ঃ আমাকে রাজা পাঠিয়েছেন। শুনেছি আপনার নাকি একটি খুব দামী এবং চমৎকার ঘোড়া আছে। ঘোড়াটি রাজার খুবই প্রয়োজন। যে কোন মূল্যে তিনি ঘোড়াটি পেতে আগ্রহী।

একথা শুনে হাতেম হাসলেন। শুকনো হাসি। বললেন ঃ আক্ষেপ! কথাটি যদি আগে বলতেন!

আপনি রাজাকে গিয়ে বলবেন- হাতেমের সেই বিখ্যাত ঘোড়াটি আপনার প্রতিনিধির আতিথ্যে নিবেদিত হয়ে গেছে বিধায় দেয়া সম্ভব হলো না। আমি দুঃখিত!

ঘটনা শুনে রাজকর্মকর্তা দুঃখিত হলো খুব। কিন্তু তাজ্জবও হলো। একজন সাধারণ কর্মচারীর জন্যে এমন একটি বিখ্যাত ঘোড়া জবাই করেও মানুষ আতিথেয়তা করতে পারে!

পাঁচ.

হাতেম তাঈ এখন নেই। পরপারে চলে গেছেন। পেছনে রেখে গেছেন এক বিশাল ইতিহাস। রীতিমত রূপকথার উপাখ্যান। দেশে দেশে হাতেম তাঈ-এর গল্প রূপকথার কাহিনীর মত মানুষের মুখে মুখে। মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে ঘুম পাড়ান হাতেম তাঈ-এর গল্প বলে। শিশুরা সেসব গল্প শুনে আবেগমথিত হয়। মায়ের গলা ধরে বলে, মা, সত্যি বলছো?

এক রাতের কথা। একটি মুসাফির কাফেলা এসে থামলো হাতেম তাঈ-এর সমাধির পাশে। আচ্ছা বল, হাতেম তাঈ-এর সমাধি কে না চিনবে? অনেকেই কবরটির চারপাশে একবার ঘুরে গেল। একজন মহামানুষের কবরের সান্নিধ্য পাওয়া কম কথা নয়। তাদের কবরও এক বিশাল ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। এখানে দাঁড়ালে এক অব্যক্ত আনন্দে চোখে অশ্রু নামে।

কিন্তু সেই কাফেলায় ছিল এক গর্দভ পুরুষ। সভ্যতার নাম-গন্ধ ছিল না তার মধ্যে। সে কি করল জানো! এক জঘন্য কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। হাতেম তাঈ-এর সমাধির উপর পদাঘাত করতে লাগল। আর বলতে লাগল, তোমার বাড়ি থেকে কোন অতিথিই নাকি না খেয়ে ফিরে না। আমরাতো আজ তোমার অতিথি। আমাদের জন্যে মেহমানদারীর ব্যবস্থা কই!

কথাগুলো বলে সে ফিরে আসল। রাত ধীরে ধীরে গভীর হলো। আর তখনই ঘটল আরেক হৈচৈ কাণ্ড। কাফেলার একটি ঘোড়া হঠাৎ করে হাত পা আছড়ে তড়পাতে লাগল এবং বিকট ধরনের শব্দ করতে লাগল। ঘুম ভেঙ্গে গেল সকলের। তারা ছুটে গিয়ে দেখল, ঘোড়াটির পা ভেঙ্গে রক্ত ঝরছে। কিন্তু কারণ অজ্ঞাত।

কী আর করা যাবে! ঘোড়াটি তো বাঁচবে না। তাই তারা দ্রুত ঘোড়াটি জবাই করে দিল। রান্না হলো। খেল সকলেই। ঘুমিয়ে পড়ল আবার যার যার বিছানায়।

ভোর হলে কাফেলা যখন আপন পথ ধরল তাদের সামনে এসে হাজির হলো এক টগবগে নওজোয়ান। নাম আদি। হাতেমের পুত্র 'আদি-'আদি ইবনে হাতেম রাতের জবাই করা ঘোড়ার মালিকের নাম ধরে তাকে খুঁজতে লাগল।

সকলেই যখন এক কণ্ঠে ঘোড়ার মালিককে দেখিয়ে দিল তখন 'আদি এগিয়ে এসে বলল ঃ আজ রাতে স্বপ্নে হাতেম আমাকে বললেন ঃ তিনি নাকি আপনার ঘোড়াটি জবাই করে এই কাফেলার মেহমানদারী করেছেন। আমাকে নির্দেশ করেছেন যেন আপনাকে একটি ঘোড়া দিয়ে দেই। নিন, এই আপনার ঘোড়া।

একথা শুনে সকলেই অবাক। সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল আর বলতে লাগল ঃ দেখ, হাতেম বেঁচে থাকতেও আমাদের আতিথ্য করেছে, মরে গিয়েও কিন্তু আতিথ্য করতে ভোলেনি। সেই সাথে তাঁর সমাধিতে পদাঘাত করার কারণে তাদের অনুশোচনারও সীমা রইলো না।

বুদ্ধি বড় হাতিয়ার

এক.

আমাদের চারপাশে যে সব প্রাণী বসবাস করে তাদেরও কিন্তু জীবন আছে, সংসার আছে, আছে সাংসারিক আয়োজন। আমরা হয়তো লক্ষ্য করি না, তারা জীবন যাপনের জন্যে কত খাটুনি খাটে, বসবাসের জন্যে কত মেহনত করে ঘর বাঁধে। তারপর মাঠ-ঘাট চষে বেড়ায় এক মুঠো খাদ্যের সন্ধানে।

এই পিপীলিকার কথাই ধর! তোমরা ছড়ায় পড়েছো-

পিপীলিকা পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও- যাও ভাই বলি!
শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।

আবার পাখির কথাই ধর ঃ

ছোট পাখি ছোট পাখি
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি
এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণ-লতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

এটা শুধু ছড়াই নয়। আসলেই পিপীলিকাও বাসা বানায়, বাসা বানায় বাবুই, বাসা বানায় ইঁদুর বিড়াল সকলেই।

এমনি এক পুঁচকে ইঁদুরের গল্পই বলি।

এক বনবাসী ইঁদুর। বনের ধারে ঘর তুলেছে। বিন্দু বিন্দু করে খাদ্যের সঞ্চয়ও করেছে বেশ। কিন্তু সঞ্চিত খাবার কি আর খেয়ে ফেলা যায়! সেটাতো দুর্দিনের সম্বল। তাই সে প্রতিদিনি সকালে বেরিয়ে পড়ে। গাছ গাছালিতে ঘুরে বেড়ায়। বনের সুস্বাদু ফল-মূল আর মিষ্টি পানি পান করে প্রাণ ভরে। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে তৃপ্ত মনে।

একদিনের ঘটনা। ইঁদুরটি বেরিয়েছিল খাদ্যের সন্ধানে। প্রতিদিনের মত সারাদিন আহার-বিহার শেষে যেই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেছে- দেখে একি সর্বনাশ! তার ঘরে শুয়ে আছে বিরাট এক অজগর। শুয়ে শুয়ে তার সঞ্চিত গুদাম সাবাড় করে ফেলার দশা! কিন্তু বেচারা ইঁদুর কি করবে এখন? দারুণ ভাবনায় পড়ে গেল। অবশেষে বনের ইঁদুরদের রাজার দরবারে গিয়ে তার ভয়ানক বিপদের কথা সবিস্তারে খুলে বলল। খুব শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা না করলে যে তার সারা বছরের সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার অচিরেই অজগর খেয়ে শেষ করে দিবে একথাও কাকুতির সাথে জানাল! সব কথা শুনে রাজা ইঁদুর মশায় বলল ঃ দেখ, বিপদ ভয়ানক! তোমার বিপদের কথা শুনে আমারও কষ্ট হচ্ছে, কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু অজগর হটাই কি করে, বল!

পাশেই উপবিষ্ট ছিল একটি বুদ্ধিমান ইঁদুর। রাজার অপারগতায় তার বেশ রাগ ধরল। সে বলল ঃ দাঁড়াও, আমি দেখছি! আমাকে সাপটি দেখিয়ে দাও! ভয়ে ভয়ে এগুতে লাগল উভয়ে। হঠাৎ লক্ষ্য করল, সাপটি তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে।

এখন কি করবে? ঝাঁপিয়ে পড়বে? ঠিক হবে না। কারণ, নাগাল পেলে অজগর ইঁদুর যুগলকে- বাদাম চিবানোর মত করে খাবে। তাই তারা একটি বুদ্ধি আঁটল। অদূরেই দেখল এক কাঠুরে মাথার নিচে

কুড়াল রেখে গাছ তলায় দিব্যি ঘুমুচ্ছে। তখন চালাক ইঁদুরটি এক দৌড়ে গাছে উঠে গেল এবং গাছে উঠেই ঝাঁপ মেরে পড়ল ঘুমন্ত কাঠুরিয়ার উপর। ঘুম ভেঙ্গে গেল কাঠুরিয়ার। রাগে ফুঁসে উঠল। হাতে কুড়াল নিয়ে দিল দৌড়। ইঁদুরটিকে মেরে ফেলবে সে।

ইঁদুর মহাসুযোগ পেয়ে গেল। সে ছুটল সাপটি যে দিকে গেছে ঠিক সেই দিকে। কাঠুরিয়া তো ছুটছে আগুন হয়ে। কিন্তু কিছু দূর যাবার পর যখন দেখল ইয়া বড় এক সাপ! তখন কাঠুরিয়া ইঁদুর ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপের উপর এবং এক আঘাতেই মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিল। আর দুই ইঁদুর দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে হাসল। আর বুদ্ধিমান ইঁদুরটি তার দুর্বল বন্ধুটিকে বলল- এবার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস কর। বন্ধুর অসাধারণ এই বুদ্ধির তারিফ করতে করতে আবেগে কেঁদে ফেলল অসহায় বনবাসী ইঁদুরটি! কথায় বলে - 'বুদ্ধি বড় হাতিয়ার'।

দুই.

বেলা সবেমাত্র ডুবেছে। এখনো আঁধার পুরো রং ধরেনি। আবছা আলোয় বেশ দূর পর্যন্ত দেখা যায়। পাশেই গ্রাম। গ্রাম পার করে বিশাল বনভূমি। গ্রামের পথ ধরে হাঁটছে একটি শেয়াল। হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করল, একটি মোরগ মাটি খুঁড়ে আহার খুঁজছে। শেয়াল ধীরে ধীরে সেদিকে এগুতে লাগল এবং লক্ষ্য করল, মোরগটি টের পেয়ে ফেলেছে। এখনই সে পালাবে। তাই ধূর্ত শেয়াল খুব আন্তরিক সুরে সালাম দিল মোরগটিকে। সালাম দিয়ে বলল, ভাগ্নে, বহুদিন হলো দেখা নেই। আচ্ছা, তোমার বাবাকে দেখি না যে! তোমার বাবার সুর কিন্তু ভারি মিষ্টি ছিল। আমি এ পথে যাবার সময় প্রতিদিনই তোমার বাবার কণ্ঠে গান শুনে যেতাম।

শেয়ালের ফাঁদে পড়ে গেল মোরগ। সেও বলে উঠল ঃ মামা, বাবার গলাটা আমিও পেয়েছি। এই বলে মোরগ চোখ দুটি বন্ধ

করল। ডানা ছড়িয়ে গলা ছেড়ে দিল এক চিৎকার। ততক্ষণে সে শেয়ালের দন্তকলে বন্দী।

মোরগটিকে দাঁতে ধরে শেয়াল যখন ভোঁ দৌড়- তখনই শেয়ালের আগমনের কথা টের পেল এলাকার কুকুর বাহিনী। দলবদ্ধ কুকুর বাহিনী ধাওয়া করল শেয়াল বাবুকে।

অসহায় মোরগটি এবার ভাবল, বাঁচার তো কোন পথ নেই। তবে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে দেখি! তাই সে শেয়ালকে বলল ঃ মামা, ওরা ভেবেছে তুমি তাদের গ্রামের মোরগ ধরেছো। তাই ওরা তোমার পিছু নিয়েছে। তুমি বল- এটা তোমাদের গ্রামের মোরগ নয়; অন্য গ্রাম থেকে এনেছি। তাহলেই দেখবে তোমার পিছু ছেড়ে দিবে।

শেয়াল ভাবল, সত্যিই তো! তাই সে হা করল কুকুরকে কিছু বলবে বলে। আর অমনিই মাটিতে ছিটকে পড়ল মোরগ। তারপর দে ছুট...!

তিন.

দুই বন্ধু বেড়াতে বের হয়েছে। বন্ধুদের একজন বয়সে একটু ছোট। কিন্তু বুদ্ধিতে পাকা। তাই বের হবার আগেই বয়সে বড়জনকে বলল ঃ বন্ধু, পথে তো বন-জঙ্গল আছে। আমার কিন্তু ভয় ভয় করছে। দ্বিতীয় বন্ধু একথা শোনতেই একেবারে জামার হাতা গুছাতে গুছাতে বলল ঃ বলিস কি! আমি থাকতে ভয় করিস? বাঘ-ভল্লুক আমার সামনে আসার সহস করবে? তুই আমাকে এত দুর্বল ভাবিস! ভাবখানা এমন যেন এখনই সে উন্মত্ত কোন বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ছোট বন্ধুটি বলল ঃ সে কথা বলিনি। বলছি রাস্তাটি নিরাপদ নয়। তাই এই অসময়ে এদিকে না গেলে হয় না! বড়জন বলল ঃ আসলেই তুই একটা কাপুরুষ!

কী আর করা যাবে। বাধ্য হয়েই রওনা হলো উভয়ে। হাঁটছে সরল পথ ধরে। পথটি সম্মুখে একটি ঘন বনের বুক চিড়ে বেরিয়ে গেছে সোজা উত্তরে।

কিন্তু নিয়তির কি কাণ্ড! বনের কাছাকাছি যেতেই ছোটজন লক্ষ্য করল বড় সাহসী (?) বন্ধুটি হঠাৎ করে সটকে পড়ল এবং এক লাফে গাছের ডগায়। ব্যাপার কি তা বুঝে উঠবার আগেই দেখলো, অদূরেই একটি ভল্লুক, এবং তার দিকেই আসছে। এখন কি করবে সে! মৃত্যু চোখের সামনে। ছুটে পালাবারও সুযোগ নেই। বন্ধুটি পালাবার সময় বললেও হতো। এখন!

কোন পথ না দেখে মাটিতে সটান শুয়ে পড়ল! ভয়ে সমস্ত শরীর তার পাথর। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। ভল্লুক তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো লাশের মত যুবকটির কাছে। নাসিকা মুক্ত করে নিরীক্ষা করতে লাগল তার চোখ, মুখ, নাক, কান সর্বত্র। লোকটি কি মারা গেছে? কারণ ভল্লুক মরা মানুষ খায় না। সকলের-ই কিছু নিয়ম থাকে এবং এই ছেলেটি ছোট হলেও ভল্লুকের এই নিয়ম জানত। তাই সে শ্বাস এমনিভাবেই চেপে ধরেছে। ভল্লুক মনে করেছে- আসলেই মারা গেছে। কতক্ষণ শোঁকে-টোকে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল ভল্লুক।

ভল্লুক চলে যেতেই নেমে এলো সাহসী বীর (?) বন্ধুটি। বলল ঃ কিরে বন্ধু। ভল্লুক তোকে কানে কানে কি বলে গেল?

বন্ধুটি একঠোঁট উপহাসের হাসি হেসে বলল ঃ ভল্লুক আমার কানে কানে বলে গেছে- যে ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রশংসা করে সে মিথ্যাবাদী। তার কথা বিশ্বাস করতে নেই। আর যে লোক বন্ধুকে বিপদে রেখে আপন প্রাণ বাঁচায় তেমন স্বার্থপরের সাথে বন্ধুত্ব করিসনে।

এবার চলো আমরা ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যাই।

নিজের খোঁড়া কূপে

অনেক দিন আগের কথা। বাদশাহ্ মু'তাসিম বিল্লাহ্ তখন মুসলমানদেয় শাসক।

মু'তাসিম দরবারে উপবিষ্ট। আরব কবিলার এক চাষা প্রজা এসেছে বাদশাহ্'র সাথে সাক্ষাৎ করতে। সবিনয় অনুমতি প্রার্থনা করল দরবারে প্রবেশের। বাদশাহ্ অনুমতি দিলেন। সে প্রবেশ করল। বাদশাহ্ তাকে কাছে ডেকে বসতে দিলেন। আন্তরিকভাবে তার কথা শুনলেন। স্বল্প সময়ে লোকটির সাথে বাদশাহ্'র ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। এখন সে বাদশাহর খুব কাছের লোকদের একজন। যখন তখন দরবারে ঢুকে পড়ে। অন্তঃপুরীতে যেতেও তার অনুমতি লাগে না।

মু'তাসিমের দরবারে এক মন্ত্রী ছিল বেজায় হিংসুক। বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিতে শূল হয়ে বিঁধল। গায়ে তাঁর প্রচণ্ড জ্বালা শুরু হল। সে ভাবল এই চাষা বৃদ্ধকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। তাই মনে মনে একটি ফন্দি এঁটে বসল সে।

মন্ত্রী একদিন এই চাষা বেচারাকে দাওয়াত করল। এ রং দাওয়াত করে তার জন্যে বিশেষ রকমের খাবার রান্না করল। তাতে প্রচুর পরিমাণে রসুন ছিল।

ইতোমধ্যে লোকটির সাথে মন্ত্রী মহাশয় বেশ সখ্যতা গড়ে তুলেছেন। কিন্তু সেই সখ্যতায় যে কুমতলব থাকতে পারে একথা ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবতে পরেনি লোকটি। কারণ, সে ছিল সরল, নেহাৎ পবিত্র মনের।

দেখতে দেখতে দাওয়াতের দিন উপস্থিত। মন্ত্রী সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতেও কসুর করেননি। বেচারাও সময় মতো গিয়ে হাজির। মন্ত্রীর ঘরের খাবার। সুতরাং কি দিয়েছে কি দেয়নি দেখার সাধ্যি কার! তাই গোগ্রাসে খেয়ে গেল উদর পূর্তি করে। খাওয়া যখন শেষ তখন মন্ত্রী বললেন ঃ তোমার মুখে তো রসুনের গন্ধ। তুমি আপাতত বাদশাহ'র কাছে যেও না। বেচারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে আসলো।

একটু পরেই মন্ত্রী আসলেন বাদশাহর দরবারে এবং খুব সান্নিধ্যে এসে বললেন ঃ দেখুন, এই যে লোকটি আছে, সে নাকি বলে বেড়ায় মহারাজের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়! কই, আমিতো তেমন কিছুই পাচ্ছি না।

একথা শুনে রাজা ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তলব করলেন লোকটিকে। আদেশ পাওয়ামাত্রই দরবারে হাজির। কিন্তু রসুনের গন্ধে রাজার কষ্ট হবে ভেবে কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে খুব কাচুমাচু করে নিবেদন করল ঃ আমাকে তলব করেছেন, জাহাঁপনা! বাদশাহ ঈষৎ মাথা নেড়ে বসতে ইংগিত করলেন। তার নাকে-মুখে হাত রাখতে দেখে মন্ত্রীর অভিযোগ সত্য- একথা বুঝতেও কষ্ট হলো না। বাদশাহ্ তখন তাঁর এক গভর্নরের নামে একটি চিঠি লিখে চাষা মানুষটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন- এটা গভর্নরের হাতে দিবে। চিঠি নিয়ে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে বেরিয়ে আসল লোকটি।

বাইরে অপেক্ষমাণ ছিল মন্ত্রী। তার হাতে মোহরবন্ধ চিঠি দেখেতো মন্ত্রীর মনে কৌতূহলের শেষ নেই! এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা কি বলেছেন? বেচারা বিনয়ের সাথে বলল ঃ এই চিঠিটি অমুক গভর্নরের কাছে পৌছে দিতে বলেছেন।

মন্ত্রী ভাবল হিতে বিপরীত হয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বড় কোন পুরস্কার-উপঢৌকনের কথা লিখা থাকবে। তার মাথায় ছিল পাজি বুদ্ধির খামার। সে তখন সঙ্গে সঙ্গে বলল ঃ তুমি বুড়ো মানুষ। কষ্ট করে এত

দূর যাবে? তার চাইতে বরং তোমার হয়ে যদি কেউ চিঠিটা গভর্নরের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তোমাকে দুই হাজার দিনার দিয়ে দেয় তাহলে কেমন হয়? সে বলল ঃ হুজুর বড় মানুষ। যা ভাল মনে করেন।

মন্ত্রী তাকে দুই হাজার দিনার দিয়ে বিদায় করে দিলেন। তারপর চিঠিটি নিয়ে পৌঁছে গেলেন গভর্নরের দরবারে। কিন্তু সে কি জানত এই চিঠিতে লেখা ছিল

'চিঠি হস্তগত হওয়ার সাথে সাথেই এর বাহককে হত্যা করে ফেলবে।'

সুতরাং যেই আদেশ সেই কাজ। পত্র হাতে পেয়ে গভর্নর সঙ্গে সঙ্গেই গর্দান উড়িয়ে দিলেন বাহকের। তিনি যে একজন সম্মানিত মন্ত্রী একথা জানার সুযোগ হলো না তাঁর।

তারপর কেটে গেল অনেক দিন। রাজা দরবারে বসেন কিন্তু মন্ত্রীমহোদয় আসেন না। রাজা ভাবনায় পড়ে গেলেন। দেশের একজন মন্ত্রী নিখোঁজ। বিষয়টি মোটেই স্বাভাবিক নয়। রাজা যখন এই চিন্তায় বিভোর ঠিক তখনই সংবাদ পেলেন, সেই গেঁয়ো চাষা লোকটি এই শহরেই আছে। রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন।

সভয়ে দরবারে এলো লোকটি। রাজার প্রশ্নের জবাবে পুরো ঘটনা খুলে বলল এবং এও বলল ঃ সে কখনো রাজার দুর্নাম করেনি। সাথে রসুন খাওয়ার ঘটনাও শুনালো রাজাকে। রাজা বুঝলেন- তাহলে এ সবই মন্ত্রীর কারসাজি। অধিকন্তু তিনি এই চাষা লোকটির সততা ও সরলতায় ভীষণভাবে প্রীত হলেন। তাকে পুরস্কৃত করলেন। আর হিংসুক বিদ্বেষী এক অসাধু মন্ত্রীর তিরোধানের শোকর জানালেন আল্লাহর দরবারে। কথায় আছে, অন্যের জন্যে গর্ত করলে সেই গর্তে নিজেরই পড়তে হয়।

সমাপ্ত

শিশু-কিশোর উপযোগী কয়েকটি বই

নীল দরিয়ার নামে
(গল্প সংকলন)

শহীদানের গল্প শোন
(সিরিজ ঃ ১-১০)

আলোর ফোয়ারা
(আরবী শিশু সাহিত্য অবলম্বনে রচিত)

কিশোর সাহাবী
(সিরিজ ঃ ১-১০)

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪